রবিদাস সাহারায়

●

দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৬০

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

উপহার
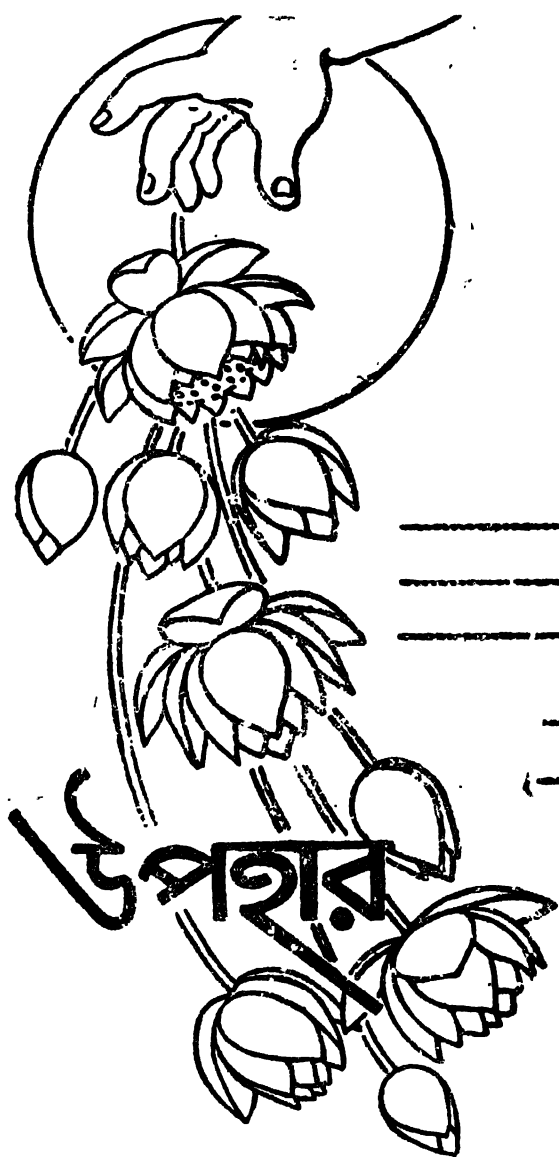
বাগবাজার বাটীতে পূজার ঘরে শ্রীশ্রীমা

॥ ১ ॥

শ্যামাসুন্দরী এসেছেন শিওড়ে তাঁর বাপের বাড়িতে।

একদিন বিকেলবেলা পুকুর ঘাটে গিয়েছেন। পুকুরের পাড়েই বেলগাছ—একটু দূরে কুমোরদের পোয়ান।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলেন শ্যামাসুন্দরী।

রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্……

কার যেন পায়ের রুপোর মল বাজছে!

শ্যামাসুন্দরী তাকালেন এদিকে ওদিকে। কই, কাউকে দেখা যাচ্ছে না তো।

হঠাৎ বেলগাছ থেকে একটা ছোট্ট মেয়ে যেন লাফিয়ে নীচে পড়ল। অমান ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরল শ্যামাসুন্দরীর। শ্যামাসুন্দরী অবাক্ হয়ে গেলেন। ভয় পেলেন। কার মেয়ে! কোত্থেকে এল এই কচি টুকটুকে মেয়েটি।

শ্যামাসুন্দরী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

জ্ঞান হওয়ার পর তাঁর মনে হল মেয়েটি যেন তাঁর পেটের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

স্বামী রামচন্দ্র মুখুজ্জে আছেন কলকাতায়।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছেন। ভাবছেন সংসারের অভাব অনটনের কথা।

ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেল। স্বপ্ন দেখলেন—একটি সোনার রঙের ছোট্ট মেয়ে দুহাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। কি তার রূপ, গায়ে তার কত অলংকার!

রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—কে মা তুমি? কেন এসেছ এখানে?

মেয়েটি জবাব দিল হাসতে হাসতে—তোমার ঘরেই তো এসেছি আমি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন গেল মিলিয়ে।

রামচন্দ্র শিওড়ে এলেন। স্বপ্নের কথা বললেন শ্যামাসুন্দরীর কাছে। শ্যামাসুন্দরী অবাক্। বললেন—আমিও তো এমনি একটি মেয়েকে দেখেছি।

স্বামীর কাছে খুলে বললেন সব ঘটনা।

দুজনেই বিস্মিত, দুজনেই চিন্তান্বিত। কেন এমন হল! কেউ কি আসছেন আমাদের ঘরে? মানবী নয়···দেবী!

একদিন ভোরবেলা হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল স্বামি-স্ত্রীর।

সারা বাড়ির বুকে অপূর্ব গন্ধ!

তাঁরা অবাক্ হয়ে গেলেন। কে এসেছে বাড়িতে?···

চিরশ্যামল সোনার বাংলার একটি গ্রাম জয়রামবাটি। কি যেন মায়ায় ঘেরা!

বারোশো যাট সালের আটই পৌষ।

জন্ম নিল এক শিশু। রামচন্দ্রের কুটীর আনন্দে ভরে উঠল। মঙ্গলধ্বনিতে গ্রামসুদ্ধ লোক সেদিন জানতে পারল নবজাতকের আগমন ঘটেছে।

ঘর আলো করা মেয়ে। এ যেন সেই মেয়েটি, যাকে শ্যামাসুন্দরী একদিন দেখেছিলেন বেলতলায়।

আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর শিশুর নাম রাখা হল ঠাকুরমণি। ডাক নাম সারদা।

গরিবের সংসার।

সামান্য কয়েক বিঘা জমিতে চাষ-আবাদ চলে। আর রামচন্দ্র নিজে করেন যজন-যাজনের কাজ। এতেই কোনমতে সংসার চলে যায়।

শ্যামাসুন্দরীও বসে থাকেন না। ক্ষেতে তুলোর চাষ হয়, সেই

ক্ষেত থেকে তুলো তুলে আনেন। সেই তুলো দিয়ে পৈতে তৈরি করে বিক্রি করেন।

ছোট্ট শিশু সারদা। তাকে কোথায় আর রেখে যাবেন? সঙ্গে করে নিয়ে যান। তুলো কুড়োবার সময় তাকে ক্ষেতের এক পাশে শুইয়ে রাখেন।

এমনি করে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে সারদা।

শ্যামাসুন্দরী আবার এলেন বাপের বাড়ি শিওড়ে। সারদার বয়স তখন দু বছর।

এক বাড়িতে গান হচ্ছে। শ্যামাসুন্দরী গান শুনতে গেলেন মেয়েকে কোলে নিয়ে।

একটি ঘরের মধ্যে গান হচ্ছে। একদিকে বসেছে পুরুষরা, আর একদিকে বসেছে মেয়েরা। প্রায় কাছাকাছি।

সারদা চারদিকে তাকাচ্ছে আর ফিক ফিক করে হাসছে। পাশেই বসেছিল সেই গাঁয়ের একটি বউ। সে জিজ্ঞেস করল সারদাকে—কিরে, বিয়ে করবি?

সারদা ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ!

আর একটি বউ রসিকতা করে বলল, ওমা, বিয়ের কথা এতটুকু মেয়ে কি বোঝে গো?

আগের বউটি জিজ্ঞেস করল—কাকে বিয়ে করবি?

সারদা আঙুল দিয়ে দেখাল—ঐ ওকে।

চমকে উঠল বউটি। চমকে উঠলেন শ্যামাসুন্দরীও। ওমা! কাকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে মেয়েটি! ও যে গদাধর। কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুজ্জের ছেলে।

বাড়ি ফিরে এসে মা বাবাকে সব কথা বললেন শ্যামাসুন্দরী। মা বাবা তো হেসেই আকুল।

আরো বড় হতে লাগল সারদা।

বেজায় চটপটে হয়ে উঠল। সবাই বলে—সারদা খুব কাজের মেয়ে।

কাজের মেয়ে না হলে তার চলবেই বা কেমন করে ?

বাবা গরিব। দিনরাত খাটেন। মা একা সংসারের কাজ করে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। তাই সারদাকে সাহায্য করতে হয় মায়ের কাজে।

খুব ভোরবেলা উঠতে হয় সারদাকে।

ভগবানের নাম করা, স্তব করা বাবা তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। সেগুলো করতে কোনদিন ভুল হয় না তার।

মায়ের শরীর খারাপ থাকে মাঝে মাঝে। সারদা সেদিন রান্না করে দেয়। ছোট মেয়ের ভাতের হাঁড়ি নামাতে কষ্ট হয়। তবু নামাতে যায়। বাবা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, পাগলী, হাত-পা পুড়ে যাবে যে !

রামচন্দ্র তখন নিজেই এসে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দেন।

জমি চাষের জন্য চাষী মজুর লাগানো হয়। তারা মাঠে কাজ করে ; সারদা তাদের জন্য মুড়ি, গুড় ও জল নিয়ে যায়।

গরুর জন্য রোজ দলঘাস কাটতে হয় পুকুর থেকে। যেদিন বাবা কাটতে না পারেন সেদিন সারদা নিজেই কেটে আনে। কোন কোন দিন গলা জলে নেমে ঘাস কাটতে হয়। সারদামণি তাতেও পিছপা হয় না। কাজে তার কোন আলস্য নেই।

আগে মা একলা জমিতে তুলো কুড়োতে যেতেন। এখন সে-ও যায় মায়ের সঙ্গে।

কোন সময় পঙ্গপাল এসে ক্ষেতের ধান সব নষ্ট করে ফেলে। কত ধান মাটিতে পড়ে থাকে। সারদা সবার সঙ্গে যায় সেই পতিত জমিতে ধান কুড়িয়ে আনতে।

তখন মেয়েদের খুব বেশী লেখাপড়া শেখার চলন ছিল না। সারদার কিন্তু খুব শখ হত লেখাপড়া শিখতে। ভাইয়েরা স্কুলে যেত, তাই সেও বায়না ধরে বসল স্কুলে যাবে।

সবাই বলত, সে কি ! তুই মেয়েমানুষ, স্কুলে যাবি কি রে ?

সারদা ঘাড় দুলিয়ে বলত, হ্যাঁ যাবো।

অবশেষে স্কুলে তাকে যেতে দিতেই হল। কিন্তু লেখাপড়া বেশী দূর আর এগোলো না।

তখন খুব কম বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হত।

তাই সারদারও বিয়ের চেষ্টা চলতে লাগল।

দরিদ্রের সংসার হলেও বড় আনন্দের। বাবা মার বড় আদরের মেয়ে সারদা। তা ছাড়াও আছেন সারদার কাকা নীলমাধব। সংসারের প্রতি কোন আসক্তি ছিল না নীলমাধবের—শুধু সারদার প্রতিই ছিল তাঁর প্রাণের টান।

নীলমাধব ছিলেন চিরকুমার। কোলে পিঠে করে মানুষ করেন তিনি সারদাকে।

সারদার পর আরও দুটি পুত্রকন্যাকে বুকে ধারণ করেছিলেন শ্যামাসুন্দরী। ভাইবোনদের ঘিরে মায়ামমতা নিয়ে সারদার জীবনের গতি এগিয়ে চলেছিল।

॥ ২ ॥

সারদা সবে পাঁচ বছর ছাড়িয়ে ছ' বছরে পা দিয়েছে।

রামচন্দ্র মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে বের হলেন।

কিন্তু পাত্র খুঁজলেই কি সহজে পাওয়া যায়? প্রজাপতির নির্বন্ধ—কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে কে বলতে পারে?

ওদিকে কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুজ্জের ছেলের জন্যও পাত্রী খোঁজাখুঁজি চলছে।

ছেলেটির নাম গদাধর। বাবা মারা যাওয়ার পর বড় দাদার সঙ্গে গিয়েছিল কলকাতা। বড় দাদা ছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের পুরোহিত, সেও তাঁর সঙ্গে থাকত। বড়দা মারা গেলেন, পূজার ভার পড়ল তার ওপর। কিন্তু পূজা-আর্চার দিকে মন নেই। সে নিজের ভাবে বিভোর। শুধু 'মা-মা' বলে ডাকে আর কি করে ভগবানের দেখা পাবে সেই ভাবনা ভাবে। সবাই বলে তাকে পাগল।

মা চন্দ্রমণি সে খবর পেয়ে ভেবেই আকুল। লোক পাঠিয়ে ছেলেকে বাড়িতে আনালেন। সবাই বলল—ছেলেকে বিয়ে করাও তবেই তার পাগলামি সেরে যাবে।

চন্দ্রমণি মেজ ছেলে রামেশ্বরকে পাঠালেন গদাধরের জন্য পাত্রী খুঁজতে। নিজেও অনেক খোঁজখবর করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও মনোমত পাত্রী জুটল না।

গদাধর সব দেখে শোনে আর মনে মনে হাসে। একদিন বলেই ফেলল, আমার জন্য কোথায় মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ? আবার যে আগেই কুটো বাঁধা হয়ে আছে।

সে কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন চন্দ্রমণি। জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় কুটো বাঁধা হয়ে আছে?

গদাধর বলল—জয়রামবাটির রাম মুখুজ্জের বাড়িতে।

ওমা, ছেলে বলে কি ? সবাই অবাক্ !

তখন জয়রামবাটিতে লোক পাঠান হল। রাম মুখুজ্জে রাজী হলেন। তবে তিনশো টাকা পণ দিতে হবে। কন্যা-পণ। আর গয়নাগাটিও দিতে হবে ছেলের বউকে। নইলে ঐ পাগলা ছেলের কাছে মেয়ে দেবে কে ?

গাঁয়ের অনেকেই ভাংচি দিয়েছিল। বলেছিল—পাগলা ছেলের কাছে মেয়ে দিও না। মেয়ে কষ্ট পাবে।

রাম মুখুজ্জে তবু রাজী হলেন। বিয়ের কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল।

বারো শো ছেষট্টি সালের বৈশাখ মাস।

বিয়ে হল গদাধরের সঙ্গে সারদার। শক্তি মিলল শিবের সঙ্গে। সারদার বয়স তখন ছয় আর গদাধরের চব্বিশ।

বিয়ের সময় খুব মুশকিলে পড়লেন চন্দ্রমণি। ছেলের বউকে গয়না দেবেন কথা দিয়েছেন কিন্তু গয়না পাবেন কোথায় ? তাই লাহাদের বাড়ি থেকে গয়না ধার করলেন। কথা দিলেন বিয়ের পর ছেলের বউ ঘরে এলেই গয়না ফেরত দিয়ে দেবেন। লাহারা বিশ্বাস করে গয়না দিল। সেই গয়না মেজো ছেলের হাতে দিয়ে চন্দ্রমণি পাঠিয়ে দিলেন বউকে সাজাবার জন্য।

বিয়ে হল। গৌরীদান করলেন রামচন্দ্র।

সাতাশ কাঠি জ্বেলে এয়োরা বরকে প্রদক্ষিণ করার সময় কাঠির আগুন লেগে পুড়ে গেল বরের হাতে বাঁধা মাঙ্গলিক ডোর। আঁতকে উঠল মেয়েরা। ছুটে এলেন সারদার মা। দেখে শিউরে উঠে বললেন, এ কি করলি তোরা ?

হাসতে হাসতে গদাধর বলল, ভালই হল তো মা। পুড়ে গেল মায়ার বাঁধন, অবিদ্যার ডোর।

গদাধরের হাতটা চেপে ধরে সারদা শুধাল, হাত পোড়েনি তো ?

হো হো করে হেসে উঠল এয়োরা।

গদাধর বিয়ে করে বউ ঘরে নিয়ে এল। বউ দেখে চন্দ্রমণির কি আনন্দ!

কিন্তু আনন্দের পরেও নিরানন্দ আছে।

লাহাদের বাড়ি থেকে গয়না চাইতে এল। চন্দ্রমণির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল—এমন সোনার প্রতিমাকে কি করে নিরাভরণ করবেন!

বউয়ের গায়ের গয়না খুলতে চন্দ্রমণির হাত ওঠে না। ছেলের কানে সে কথা গেল।

গদাধর বলল, এতে ভাববার কি আছে? আমি গয়না খুলে দিচ্ছি।

সারদা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। গদাধর একটি একটি করে তার গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নিল।

কিন্তু পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে জেগেই চমকে উঠল সারদা। এ কি! তার গায়ের গয়না কোথায়? জিজ্ঞেস করতে লাগল বাড়ির সবাইকে, কাল রাত্রে আমার গায়ে গয়না ছিল সেগুলো কোথায় গেল?

চন্দ্রমণি আর সইতে পারলেন না। দুহাতে সারদাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। বললেন—মা, ওর জন্য ভাবছো কেন? গদাই তোমাকে ওর চেয়েও ভালো গয়না দেবে।

সারদা শান্ত হল। কিন্তু শান্ত হলেন না সারদার কাকা। তিনি সারদার সঙ্গেই এসেছিলেন। রেগে গিয়ে বললেন—বুঝতে পেরেছি, এসব চালাকি।

সারদাকে কোলে তুলে নিয়ে তখনই সোজা জয়রামবাটির দিকে রওনা হলেন।

সারদার বয়স তখন সাত। গদাধর শ্বশুরবাড়ি এল।

সারদা এল ঘটিতে জল নিয়ে। স্বামীর পা ধুইয়ে দিল। পা মুছিয়ে দিয়ে বাতাস করতে লাগল পাখা দিয়ে।

যে স্বামী তার গা থেকে গয়না খুলে নিয়েছিল তার ওপর তার কোন অভিমান নেই।

লোকে বলে পাগলা জামাই। তা বলুক। সারদার কিন্তু গদাধরকে খুব ভাল লাগে। সে যে আপনভোলা শিব।

কয়েকদিন জয়রামবাটিতে থেকে গদাধর সারদাকে নিয়ে ঘরে ফিরল কামারপুকুরে। মা বলে দিয়েছিলেন, তাঁর কথা কি অমান্য করা যায়।

অনেকদিন পর বউকে দেখে চন্দ্রমণির খুশি আর ধরে না।

গদাধর কিন্তু ব্যাকুল হয়ে উঠল দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য। চন্দ্রমণি বললেন, আরো কিছুদিন থেকে যা।

গদাধর রইল না। দক্ষিণেশ্বরে চলে গেল।

সারদামণি তখনও শিশু। মাকে ছাড়া বেশী দিন থাকতে পারে না। তাই চন্দ্রমণি তাকে বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সারদামণি ফিরে এল জয়রামবাটিতে।

॥ ৩ ॥

বাড়িতে সারদার কাজের বিরাম নেই।

পুকুরে নেমে গলা-জলে দাঁড়িয়ে গরুর জন্য ঘাস কাটে। তাকিয়ে দেখে তারই মত আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জলের মধ্যে। বয়স তারই মত, দেখতে কালো। সে তাকে ঘাস এগিয়ে দেয় হাতের কাছে।

সারদা অবাক্ হয়ে যায়। কে মেয়েটি! তাকে তো কোনদিন দেখে নি। চেনেও না। তবু মনে হয় যেন চেনা।

পল্লীজীবনের মায়া দিয়ে ঘেরা সারদার মন।

কখনো কল্পনার রঙিন পাখা মেলে সেই মন উধাও হয়ে যায়। সারাদিনের শত কাজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। আবার চমকে ওঠে হঠাৎ।

কি যেন ছায়া দেখতে পায় নিজের পেছনে। কে তার সঙ্গী!

কই, কেউ না তো!

নিজের মনের আয়নায় সে দেখতে পায় নিজেরই ছবি।

কখনো দেখতে পায় আবার কখনো সেই ছবি হারিয়ে যায়। সারদা বুঝতে পারে না এর রহস্য।

ঐ যে দীঘির কালো জলে ঐ কালো মেয়ে—ঐটিই বা কে? সব মুখের আকৃতি যেন এক সঙ্গে মিলে যায়।

একি মায়া না মহামায়া!

বাঁকুড়ায় সেবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

মানুষের হাহাকারে ভরে উঠল আকাশ বাতাস।

রামচন্দ্রের বাড়িতে লোক আসতে লাগল দলে দলে। রামচন্দ্র নিজেই তো গরিব, পরকে খেতে দেবে কি করে?

কিন্তু কে তাদের বলে দিয়েছে কে জানে! রামচন্দ্রের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা।

সারদাই তো লক্ষ্মী! রামচন্দ্রের ভয় কি। তাঁর মরাই ভরা ধান। ধান সেদ্ধ করে চাল করা হল। রান্না হতে লাগল হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি।

ক্ষুধায় কাতর হয়ে যে আসে সে আর ফিরে যায় না। সারদা কোমর বেঁধে লেগে যায় খিচুড়ি পরিবেশন করতে।

কোনদিন কুলোয় না। আবার নতুন হাঁড়ি চড়ান হয়। খিচুড়ি জুড়োবার জন্য সারদা পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকে। লোক যে খিদেয় কাতর হয়ে বসে আছে। লোকের খিদের জ্বালা তাড়াতাড়ি মেটাবার জন্য তারও কত আগ্রহ!

এই তো সারদার রূপ! এই তো সারদার পরিচয়।

জয়রামবাটির শান্ত জনবিরল পরিবেশে কাটতে থাকে দিনের পর দিন!

আনমনা বালিকা সারদা বাল্যকাল অতিক্রান্ত করে এসে দাঁড়ায় কৈশোরের সীমায়।

ডাক আসে কামারপুকুর থেকে। চন্দ্রমণি ডেকেছেন। দেখতে চেয়েছেন তাঁর পুত্রবধূকে।

সত্যই তো, ছেলের বউকে নিয়ে সাধ-আহ্লাদ করার ইচ্ছা কার না হয়। শ্যামাসুন্দরী আপত্তি করেন না। মেয়েকে পাঠিয়ে দেন কামারপুকুরে।

সারদার বয়স তখন বারোর কোঠায়।

চন্দ্রমণির মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু অন্তরে তাঁর হাহাকার। ছেলে গদাধর কি ঘরসংসারী হবে না?

ছেলের বউকে নিয়েই ছেলের শখ মেটান কিছুদিনের জন্য।

সারদার মনও বুঝি হাহাকার করে ওঠে শূন্য এক বেদনায়। নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করে···আনমনা হয়ে থাকে।

চান করতে যেতে হয় হালদার পুকুরে। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা

দূর। নির্জন পথ। একা যেতে সারদার ভয় করে। কেমন যেন ছমছম করে ওঠে গা।

লজ্জায় চন্দ্রমণিকে কিছু বলে না। তিনি ভাববেন কি? গাঁয়ের মেয়ের এত ভয় থাকলে চলে!

খিড়কির ছোট দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সারদা গড়িমসি করে কতক্ষণ। তারপর একাই রওনা হয়। কিন্তু একি! নির্জন পথ মুহূর্তে ভরে যায়। সারদামণি তাকিয়ে দেখে ওর আগে চলেছে চারজন মেয়ে আর পেছনে চলেছে চারজন। তারাও চানে চলেছে হালদার পুকুরে।

সারদার সঙ্গে ওরাও চান করে আবার ফিরে আসে। চারজন আগে। চারজন পেছনে। সারদার সঙ্গে ওরা কথা বলে না। সারদাও লজ্জায় কথা বলে না ওদের সঙ্গে। এ গাঁয়ের নতুন বউ সে, কেমন করে যেচে আলাপ করবে?

এরকম রোজই হত। অথচ কোনদিন সারদা তাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারে নি।

অনেককাল পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ওরা দুর্গার অষ্টসখী।

কয়েকমাস কামারপুকুরে থাকার পর সারদা আবার জয়রামবাটিতে ফিরে গেল।

সেখানেও সারদা প্রায় একা। সঙ্গীসাথী যারা ছিল তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সবাই চলে গেছে স্বামীর ঘর করতে। সারদার ভাগ্যেই বুঝি শুধু স্বামীর ঘর নেই।

স্বামী থাকে দক্ষিণেশ্বরে পূজা নিয়ে আর নিজের খেয়াল নিয়ে। শুধু আপনভোলা নয়—দুনিয়ার সবকিছু সে ভুলে আছে।

আগে সারদা এত কিছু বুঝত না। কিন্তু এখন বয়স হচ্ছে—বুঝতে শিখেছে। তার সমবয়সী মেয়েদের কথা ভাবে আর তার মন খারাপ হয়ে যায়।

কিছুদিন পর সারদা খবর পেল গদাধর কামারপুকুরে এসেছে। কয়েকদিন পরেই চলে যাবে।

একদিন একজন লোক এসে উপস্থিত হল কামারপুকুর থেকে। চন্দ্রমণি পাঠিয়েছেন তাঁর ছেলের বউকে নিয়ে যাবার জন্য।

শ্যামাসুন্দরী মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে যাবি?

সারদা বললে, হ্যাঁ মা যাব।

মা খুশী মনে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠালেন।

সারদা কামারপুকুর গেল। গদাধর অবাক্ হয়ে তাকাল সারদার দিকে। নিজের বউ এত ডাগরটি হয়ে উঠেছে।

সারদার চোখে মুখেও এক অস্বাভাবিক লজ্জা। এর আগে তা কখনো হয়নি। চেতনা-বোধ জাগবার পরে স্বামীর সঙ্গে এই তার প্রথম দেখা।

সারদামণি নিজেকে বিলিয়ে দিল দেবদুর্লভ স্বামীর চরণতলে। স্বামী শেখাল পত্নীকে সংসারের নিত্যকর্ম পদ্ধতি। শেখাল সাঁঝের প্রদীপ জ্বালানো, ঘর নিকানো, অতিথিসেবা।

ভাবের জগৎ থেকে আবার সহসা ফিরে এল গদাধর। কাকে কি শেখাচ্ছে?...কে এই সারদা?...

সারদামণির আজ নূতন রূপ।

গদাধরের রূপও আজ নূতন। ভাবপাগল চঞ্চলপ্রকৃতি আজ শান্ত স্তব্ধ—জ্ঞান-গম্ভীর।

॥ ৪ ॥

গদাধর সন্ন্যাস নিয়েছেন। তাই তাঁর মুখে আজ নূতন বাণী। স্ত্রীকে শিক্ষা দিচ্ছেন ত্যাগময় জীবনের আদর্শ।

স্বামীকে ভক্তি করবে। গুরুজনদের ভক্তি করবে। আত্মীয়-পরিজনকে ভালবাসবে। অতিথিদের সেবা করবে।

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য কি জানো? ভগবানকে লাভ করা। তাঁর কাছে নিজের যা কিছু আছে সবকিছু সঁপে দেওয়া। এমন কি আত্মা পর্যন্ত।

সারদামণি শুনছেন আর স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

স্বামীকে তিনি দেখছেন আজ আর এক রূপে। এ যেন ত্যাগী ব্রহ্মচারী মহেশ্বর!

গৌরী আজ যেন দেখছেন সর্বভোলা শিবকে।

গদাধর চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর আত্মা যে সেখানে। আত্মাকে ছেড়ে কায়া কতদিন থাকতে পারে! আত্মা কায়াকে ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু কায়া কি কখনো আত্মাকে ছেড়ে যায়!

গদাধর দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে যেন নিজের আত্মাকেই ফিরে পেলেন। সারদাও কামারপুকুরে বেশী দিন রইলেন না।

এবার কিন্তু অন্যরকম মন সারদার! সেই চঞ্চলতা নেই—আকুলতা নেই। স্তব্ধ—ভাবগম্ভীর।

আগে তিনি মাঝে মাঝেই দেখতেন এক শ্যামা মেয়ের মূর্তি। কখনো ছায়ার মত—কখনো স্পষ্ট। সেই মেয়েকে এখন আর তিনি দেখেন না। নিজের আত্মা থেকে মনকে সরিয়ে রাখার জন্যই তাঁর ঐরূপ দর্শন হত। এখন ঠাকুর তাঁকে পথের নির্দেশ দিয়েছেন।

সারদামণি এখন নিজের আত্মায় ফিরে গিয়েছেন। তিনি একক— তিনি সম্পূর্ণ।

সারদামণি যতই নিজের মনকে সংযত করছেন, ততই তিনি মনে অনুভব করছেন একটি অনুপ্রেরণা—একটি আকুলতা। সেই অনুপ্রেরণা ঠাকুরের দর্শন আর সেই আকুলতা ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ।

শবরী রামের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন। সতী করেছিলেন শিবের জন্য। সারদামণি তেমনি ঠাকুরের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

একদিন সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। সুযোগ এল।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা। শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি। সে উপলক্ষে গাঁয়ের অনেকেই যাচ্ছে কলকাতায় গঙ্গাস্নান করতে।

সারদামণি ভাবলেন এই সঙ্গে আমিও তো গেলে পারি। তা হলেই তো দেখতে পারি তাঁকে। গঙ্গাস্নান ও দেবতা দর্শন সবই একসঙ্গে হবে। স্বামী দর্শনই তো দেবতা দর্শন।

বাবার কাছে প্রথমে কিছু বলতে ভরসা পেলেন না সারদা। যাঁরা কলকাতা যাচ্ছে তাদের কাছে বললেন—আমি গঙ্গাস্নানে যাবো, আমাকে নেবেন ?

সবাই অবাক্। একি ! এ বয়সে কি গঙ্গাস্নানে যাবে ?

অনেকে সারদার মনের কথাটা বুঝতে পারল। তারা গিয়ে বলল রামচন্দ্রের কাছে। রামচন্দ্র রাজী হলেন। কিন্তু মেয়েকে তাদের সঙ্গে যেতে দিতে রাজী নন। তিনি নিজে যাবেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

অনেক দূরের পথ কলকাতা। ট্রেন স্টীমারের কোন ব্যবস্থা নেই। এক পালকি না হয় পায়ে হাঁটা। কিন্তু পালকি ভাড়া করার মত অবস্থা নয় রাম মুখুজ্জের। তাই পায়ে হেঁটেই যেতে হল।

পথের পর পথ। মাঠের পর মাঠ। পথেরও শেষ নেই, মাঠেরও শেষ নেই। এত হাঁটা অভ্যাস নেই সারদামণির। তার উপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। অনেক দূর গেলে হয়তো একটু গাছের ছায়া পাওয়া যায়। অনেক হাঁটলেই হয়তো পাওয়া যায় কোন্ পুকুর।

ক্লান্তিতে পা ভেঙে আসে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়।

তবু অবিশ্রান্ত পথ হেঁটে হেঁটে দুদিন কাটল। আর বুঝি কাটে না। ভয়ানক জ্বর এসে গেল সারদার।

রামচন্দ্র মেয়ের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারলেন। সারদার পক্ষে আর হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়।

সামনের এক চটিতে গিয়ে তাঁরা আশ্রয় নিলেন।

মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন রামচন্দ্র। পথের মাঝে কি বিপদই না ঘটল। কে জানে কতদিন থাকতে হবে এই চটিতে।

জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ সারদা। হঠাৎ সেই কালো মেয়েটি তার বিছানার পাশে এসে বসল।

সারদা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে গা? কোত্থেকে এসেছ?

কালো মেয়েটি বলল, আমি এসেছি দক্ষিণেশ্বর থেকে।

সারদা বললেন, আমিও তো দক্ষিণেশ্বরে যাবো বলেই বেরিয়েছি। পথে এই জ্বর। বলো তো কি বিপদ!

কালো মেয়েটি বলল, ভয় নেই, জ্বর তোমার সেরে যাবে। এই বলে মাথায় ও গায়ে হাত বুলাতে লাগল। কি নরম আর ঠাণ্ডা সেই হাত!

সারদামণির গা যেন এক মুহূর্তে শীতল হয়ে গেল। একটু যেন হুঁশ হল তাঁর। তাই জিজ্ঞেস করলেন, কেউ তোমাকে পা ধোবার জল দেয় নি?

মেয়েটি বলল—মা বোন, আমি এখুনি চলে যাবো। শুধু তোমাকে দেখতে এসেছি।

সারদামণি বললেন, ভেবেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে দেখব। কিন্তু আমার ভাগ্যে বুঝি কিছুই হল না।

মেয়েটি বলল, সেকি! তুমি যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি!

মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি।

পরদিন ভোর হতে না হতেই জ্বর ছেড়ে গেল সারদামণির। বললেন, বাবা চলো।

রামচন্দ্র বললেন, সেকি? এই শরীর নিয়ে তুই হাঁটতে পারবি?

—খুব পারবো বাবা।

মেয়ের আগ্রহ দেখে রামচন্দ্র আর আপত্তি করলেন না। হেঁটে আবার যাত্রা শুরু করলেন। কিছুদূর যেতে একখানা পালকি মিলল। সেই পালকিতে উঠে তাঁরা চলতে লাগলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে।

তাঁরা যখন দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি গেলেন তখন বারবেলা। তাই বারবেলাটা একটা নৌকায় আশ্রয় নিয়ে সেখানেই কাটিয়ে দিলেন। যখন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পৌঁছলেন তখন রাত নটা।

সব খোঁজখবর নিয়ে রামচন্দ্র ও অন্যান্য লোকেরা নহবতের ঘরে চলে গেলেন। সারদা গিয়ে ঢুকলেন রামকৃষ্ণের ঘরে।

পথের ক্লান্তিতে ও জ্বরে সারদার চেহারা ভারী খারাপ হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে চমকে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, তুমি এসেছ? ভালোই করেছ। বসো।

বসলেন সারদা। ঠাকুর বললেন, এখন কি আমার সেজবাবু আছে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে। কে আর তোমাদের আদর-যত্ন করবে?

ভক্ত জমিদার মথুরামোহনের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন রামকৃষ্ণ। কয়েকমাস আগে তিনি মারা গেছেন। সেই কথার জের টেনে রামকৃষ্ণ বললেন, সে থাকলে তোমাকে অট্টালিকায় রাখতো।

সারদা বললেন, আমি নহবতের ঘরে থাকবো।

ব্যস্ত হয়ে রামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, না না, তুমি আমার ঘরেই থাকো। তোমার আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তখন রাতের খাওয়া-দাওয়া সবার হয়ে গিয়েছে। ভাগনে হৃদয়কে ডেকে ঠাকুর বললেন, ওরে হৃদে, এদের কিছু খাবার ব্যবস্থা কর।

হৃদয় ধামা ভরতি মুড়ি নিয়ে এল। সবাই সেই মুড়ি খেল। সারদাও তাই ক'টি চিবিয়ে শুয়ে পড়লেন।

মাদুরের ওপর রাত্রিতে বেশ শান্তিতেই ঘুমুলেন সারদা।

পরদিন ঠাকুর বললেন—তোমার জ্বর হয়েছে, আমাকে বলোনি কেন?

সারদা বললেন, না, জ্বর সেরে গেছে।

তখনই ঠাকুর সারদার জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করলেন, পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন ঠাকুর নিজের হাতেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই সারদা বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। এবার নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরলেন রামচন্দ্র।

ঠাকুর একদিন জিজ্ঞেস করলেন সারদামণিকে, কিগো, তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?

সারদামণি জবাব দিলেন, না আমি তোমাকে কেন সংসারপথে টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।

মা চন্দ্রমণি তখন দক্ষিণেশ্বরে, নহবতের ঘরে আছেন। সারদার থাকবার জায়গাও ওখানেই হল। শাশুড়ীর সঙ্গে বাস করতে লাগলেন সারদা।

তোতাপুরী একদিন রামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, বউকে দেশে রেখে খুব কামজয়ের বড়াই করছ। থাকত তোমার কাছে তা হলে বুঝতুম তুমি কেমন বাহাদুর।

রামকৃষ্ণ তার জবাব দিতে পারেন নি। আজ তার জবাব দেবার সময় এসেছে। সময় এসেছে পরীক্ষা দেবার।

রামকৃষ্ণ সারদাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। বললেন, আজ থেকে তুমি আমার এখানে শোবে।

সেকথা জানতে পারলেন চন্দ্রমণি। ভাবলেন, যাক্, ছেলের বুঝি সংসারে মতি হয়েছে।

প্রায় আট মাস ঠাকুর স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে শয়ন করলেন।

এত কাছাকাছি থেকেও সারদামণি কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে অনেক দূরে। তিনি কিছুতেই ঠাকুরের নাগাল পান না।

মাঝে মাঝে অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় সারদার। ঘোমটাটি সরিয়ে পরিপূর্ণ চোখে ঠাকুরকে দেখেন। এখনো বসে আছেন খাটের ওপর।

একদিন এক ব্যাপার দেখে চমকে উঠলেন সারদা।

এতো রাতেও ঘুমাননি ঠাকুর।

ঘুম তো দূরের কথা, পাষাণের মত নিশ্চল। নিঃশ্বাস পড়ছে কি না কে জানে!

সারদার ভয় হল। বাইরের বারান্দায় শুয়েছিল কালীর মা, তাকে গিয়ে ডেকে তুললেন। কালীর মা ছুটে গিয়ে হৃদয়কে ডেকে আনল। হৃদয় মন্ত্র শোনাতে লাগল ঠাকুরকে। মন্ত্র শুনতে শুনতে সমাধি-ভূমি থেকে নেমে এলেন রামকৃষ্ণ।

ঠাকুর একদিন বললেন সারদাকে, তুমি বড় ভীতু। সমাধি হলে কোন কোন দিন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তুমি আমার কানে নাম দিও, না হয় বীজমন্ত্র দিও।

—সে কি আমি জানি? সংকুচিক ভাবেই বললেন সারদা।

কি করে নাম বা বীজমন্ত্র দিতে হয় তাও ঠাকুর তখন সারদামণিকে শিখিয়ে দিলেন।

এর পর থেকে সারদামণির ভয় কমে গেল।

ভয় তো কমলো কিন্তু মনের আকুলতা কমলো না। লোকে কত দূর দূর থেকে ঠাকুরকে দেখতে আসে, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়। কিন্তু আমি ধন্য হলাম কই? এ দুঃখ তিনি কার কাছে জানাবেন!

সময় সময় সাধারণ নারীধর্ম জেগে উঠত সারদার মনে। নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতেন, ছেলেপুলে একটাও হবে না, সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে!

কিন্তু ঠাকুর অন্তর্যামী। তিনি সবকিছু বুঝতে পারেন। বললেন, একটা ছেলে খুঁজছো কি গো, তোমার এত ছেলে হবে যে, মা ডাকে তিষ্ঠোতে পারবে না।

পাশাপাশি দুটি খাট। বড় খাটটিতে রামকৃষ্ণ। ছোটটিতে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে ঘুমিয়ে আছেন সারদা।

রামকৃষ্ণ আকুল নিবেদন করছেন মায়ের কাছে।—মা, সংসার নারীকে ভোগবতী করেছে, তুই একে ভগবতী কর। আবার বলছেন, আমার স্ত্রীর ভেতর থেকে কাম ভাব দূর করে দে।

॥ ৫ ॥

গভীর রাত্রি।

ঠাকুর সমাধিতে মগ্ন। সারদা তাকিয়ে থাকেন সমাধিমগ্ন ঐ মূর্তির দিকে। ভাবজগতের বাইরে যেন চলে গিয়েছেন ঠাকুর। সারদা দেখেন আর ভাবেন। কে এই রামকৃষ্ণ!

ঠাকুরের মনেও বুঝি প্রশ্ন!

'কথং ত্বং জননী ভূত্বা মম বধূরূপেণ সংস্থিতা ?'

জননী হয়ে কেমন করে আবার বধূরূপে আমার ঘরে বিরাজ করো ?

মা মন্দিরে আছেন। তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন। আবার তিনিই নহবতে বাস করছেন। সেই তিনিই আমার পদসেবা করছেন। মা বহুরূপিণী শক্তি।

ঠাকুরের চরণ সেবা করতে করতে সারদামণি বললেন, আমাকে তোমার কি বলে মনে হয় ? আমি তোমার কে ?

ঠাকুর প্রসন্নহাসি হেসে বললেন—তুমি আমার আনন্দময়ী।

সারদামণি নির্বাক্। ভবনেশ্বরীর মধ্যে ভুবনেশ্বরীকে দেখছেন ঠাকুর।

এই জগতের যিনি মা, তিনি থাকেন কোথায় ?

ছোট্ট একটুখানি ঘর, ছোট্ট একটু দরজা। ঢুকতে গেলে মাথা ঠেকে যায়। ঘরের চারপাশে সরু বারান্দা, তাও দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা। এরই নাম নহবত।

এই ঘরেই থাকেন মা সারদা। ঠাকুরের ঘর থেকে তিনি আবার এখানেই চলে এসেছেন!

এই ছোট ঘরটিতে বিরাট সংসার। হাঁড়িকুড়ি, বাসন-কোসন, ভাঁড়ারের সাজসরঞ্জাম, তেল-নুন সবকিছু। একপাশে খাবার জলের জালা আর এক পাশে হাঁড়িতে ঠাকুরের জন্য মাছ জিয়োনো।

নানা জায়গা থেকে মেয়েরা সারদামণিকে দেখতে আসে। কিন্তু দেখবে কি! ঘোমটা যে তাঁর মাথায় লেগেই আছে সব সময়ে। পরনে চওড়া লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি। কালো ভরাট মাথার চুল পা পর্যন্ত ঠেকেছে। গলায় সোনার কণ্ঠিহার। নাকে নথ, কানে মাকড়ি। প্রকৃতি-ভাব সাধনের সময় মথুরবাবু যে চুড়ি দিয়েছিলেন ঠাকুরকে, তিনি তা সারদামণিকে দিয়ে দিয়েছেন।

ভক্তিমতি সারদা দেবী। স্বামী ভক্তি দেব ভক্তি···কোন কিছুতে তাঁর ত্রুটি নেই।

রোজ রাত তিনটের সময় বিছানা ছেড়ে উঠে গঙ্গাস্নান করতে যান। আধো অন্ধকারে গা ছমছম করে। কিন্তু সহায় হয় তাঁর কোন্ এক অলৌকিক শক্তি। মা দেখতে পান নহবত থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত একটি আলোর রেখা। ওটা যেন অন্ধকার পথে চলার সংকেত। কোথা থেকে সেই আলোর রেখা আসে কে জানে?

তারপর সন্ধ্যা-আহ্নিক জপ তপ···তারপর সংসারের নিত্যকর্ম। সর্বনিপুণা সারদা।

ঠাকুরের খাবার তৈরী থেকে শুরু করে শাশুড়ী চন্দ্রমণির সেবাযত্ন সবই মা সারদা নিজের হাতে করেন।

যতদিন চন্দ্রমণি জীবিত ছিলেন ঠাকুর নহবত ঘরে এসে খেয়েছেন। চন্দ্রমণি গত হলে ঠাকুর বললেন, আমি আমার ঘরে বসে খাব।

তাই হল। সারদামণি থালায় খাবার সাজিয়ে নিয়ে যান ঠাকুরের ঘরে। ঘোমটা টেনে কাছে বসেন, যতক্ষণ না ঠাকুরের খাওয়া শেষ হয় ততক্ষণ কাছে বসে থাকেন। দু একটা কথাও ঠাকুরের সঙ্গে হয়। কোনদিন খেতে খেতে ঠাকুর বলেন—বাঃ, এটা খুব ভালো হয়েছে তো! সত্যি তুমি খুব ভালো রান্না করতে পারো।

সারাদিনের মধ্যে এই তাঁর একটুখানি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁর পাশে একটু বসবার সুযোগ পান।

ঠাকুরকে খাইয়ে নহবতে ফিরে এসে পান সাজতে বসেন সারদা।

পান সাজবার সময় গান গাইতে থাকেন গুনগুনিয়ে—'ও প্রেম রত্নধন রাখতে হয় অতি যতনে।'

নীলকণ্ঠ নামে এক ভক্ত মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসত। সে গান গাইত চমৎকার। তার কাছ থেকেই গানের কয়েকটি কলি শিখে নিয়েছেন সারদা।

সারদা নিজের হাতে রেঁধে—নিজে সামনে বসে ঠাকুরকে খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। তাই এই সময়টির জন্য ছিল তাঁর আকুল প্রতীক্ষা।

একদিন ঠিক সময়ে ভাতের থালা নিয়ে নহবত ঘর থেকে বেরিয়েছেন সারদা, হঠাৎ গোলাপ-মা এসে উপস্থিত। গোলাপ-মাও ঠাকুরের বড় ভক্ত। তিনি সারদার হাত থেকে থালাটা কেড়ে নিলেন। বললেন—দাও, আমি ঠাকুরকে দিয়ে আসি।

সারদা কিছু বলবারও সুযোগ পেলেন না। গোলাপ-মা হনহন করে থালাটা নিয়ে চলে গেলেন ঠাকুরের ঘরে।

সেই থেকে কি যে হল, গোলাপ-মা-ই খাবার থালা নিয়ে যায়। এক বেলা নয়, দু বেলাই। গোলাপ-মা ঠিক সময়ে এসে হাজির হয় নহবত ঘরের সামনে। সারদা কিছু বলতেও পারেন না। নিঃশব্দে তুলে দেন থালা তাঁর হাতে।

এতদিন ঠাকুরকে কিছুক্ষণ দেখার, তাঁর পাশে কিছুক্ষণ বসার যে সুযোগ ছিল তাও গেল। মা সারদা মনে মনে দুঃখ করতে লাগলেন।

মনে মনে অভিমান হল সারদার। কই, ঠাকুর তো কিছু বলেন না। তিনিও বেশ নির্বিবাদে খেয়ে যাচ্ছেন।

কই, আগে তো ঠাকুর এমন ছিলেন না।

কিছুদিন আগেকার এক ঘটনার কথা মনে পড়ল সারদার। ঠাকুরের জন্য খাবারের থালা হাতে নিয়ে বেরিয়েছেন, এমন সময় এক বর্ষীয়সী মহিলা তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। বলল—মা আমাকে দিন।

সবার মা সারদা। অনুরোধ রক্ষা করলেন। মহিলার হাতে থালাটি দিয়ে তিনি পেছনে পেছনে চললেন। মহিলাটি ঠাকুরকে খাবার দিয়েই চলে গেল।

সারদা দাঁড়িয়েই ছিলেন। ঠাকুর কাছে ডেকে বসতে বললেন। সারদা পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন ঠাকুরকে।

ঠাকুর বললেন, সকলের হাতে ছোঁয়া আমি খেতে পারি না—একথা তোমার জানা আছে। কেন তুমি অপরের হাতে দিলে?

'আজকে খাও।' লজ্জিত হয়ে বললেন সারদা দেবী।

ঠাকুর বললেন, জানো না ও কে? আজ আমার খাওয়া হবে না।

মা আবার বললেন, আজকে খেয়ে নাও। অনেক কাকুতিমিনতি করলেন।

ঠাকুর বললেন, ভবিষ্যতে কখনও আমার খাবার পরের হাতে দেবে না, শপথ করে বল সে কথা। তবে আমি খাবো—নইলে নয়।

মা সারদা হাত জোড় করে বললেন, না না, সে আমি পারব না ঠাকুর। মা বলে যে ডাকে আমি তো তারই। মা বলে হাত পেতে চাইলে তাকে ফিরিয়ে দেবো কেমন করে! তা ছাড়া তুমি তো আমার একার ঠাকুর নও—তুমি সকলের। তবে তুমি যখন বলছ তোমার খাবার আমি নিজের হাতেই আনবার চেষ্টা করব।

ঠাকুর আর আপত্তি করলেন না। খুশী হয়ে খেতে লাগলেন।

সেই ঠাকুর এখন ছুবেলাই গোলাপ-মার হাতে খাচ্ছেন। কই, আপত্তি তো করেন না। সারদাকে কাছেও ডাকেন না।

গোলাপ-মা ঠাকুরের একজন বড় ভক্ত, সারদা তা জানেন। চণ্ডী বলে একটি মেয়ে ছিল তার, পাথুরেঘাটার বাড়িতে বিয়ে দিয়েছিল। অকালে মেয়েটা মরে গেল, সেই থেকে মা পাগলের মত হয়ে গেল। পড়ল এসে ঠাকুরের পায়ে। সেই থেকে ঠাকুরের আশ্রয়েই আছে।

সেই গোলাপ-মাকে কি এতই ভালবাসেন ঠাকুর? এত কেন?

সময় সময় ছুঃখে ও অভিমানে ভেঙে পড়ে সারদামণির মন। আবার মনে মনে ভাবেন, ছুঃখ অভিমান করে লাভ কি! তিনি এমন কি পুণ্য করেছেন যে ঠাকুরকে রোজ ছুবেলা দেখতে পাবেন?

পুণ্যের জোর না থাকলে কি কেউ ঠাকুরের দর্শন পায়?

অনেকদিন পর মা বাবা ও ভাই বোনদের দেখে তাঁর মনে কি আনন্দ। কিন্তু সে আনন্দ বেশী দিন রইল না। বাবা হঠাৎ অসুখে পড়লেন।

অসুখ হয়েই একেবারে বাড়াবাড়ি।

সারদা ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাবার সেবাশুশ্রূষা করার জন্য। কিন্তু সময় আর পেলেন কই ?

সংসারের সকলকে অকূলে ভাসিয়ে রাম মুখুয্যে হঠাৎ পরলোকে চলে গেলেন।

কত কাঁদলেন সারদা। বাড়ির সবাই কাঁদল।

কিন্তু কাঁদলেই কি আর মরা মানুষকে ফিরে পাওয়া যায় ?

মনে ভয়ানক শোকের আঘাত পেলেন সারদা।

কিন্তু উপায় কি ! ভগবান যা দুঃখ দেবেন তা বুক পেতে নিতেই হবে।

তবু মন কি মানে ?

মা সারদা ভাবলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেই হয়তো শান্তি পাওয়া যাবে।

কয়েকদিন পর দুঃখের আঘাত বুকে চেপে মা দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন।

॥ ৭ ॥

আবার সেই নহবত ঘরেই আছেন সারদা।

ঘর তো নয় একটা পায়রার খোপ। যেন একটা অন্ধকার কারাগার। তাতে বন্দিনী হয়ে আছেন মহামায়া!

সত্যি, নহবত ঘরে মার খুব কষ্ট হচ্ছে।

সারদা মুখ ফুটে কিছু বলেন না। কিন্তু ঠাকুর সব বুঝতে পারেন।

কথায় কথায় ঠাকুর শম্ভু মল্লিকের কাছে একদিন সেকথা বললেন। শম্ভু মল্লিক বলল, সে কি, মা কেন অমন কষ্ট পাবেন? আমরা আপনার ভক্তরা আছি কি করতে?

ভক্ত শম্ভু মল্লিক কয়েক দিনের মধ্যেই মন্দিরের কাছে জমি কিনে দিলেন। এক ভক্ত পাঠিয়ে দিল শালকাঠ। তাই দিয়ে সেখানে চালাঘর তৈরী হল।

ঠাকুর বললেন সারদাকে, তুমি এখন থেকে চালাঘরে থাকো। নহবত ঘরে খুব ছোট জায়গা, বড় কষ্ট হয় তোমার।

সারদা কিন্তু খুব খুশী নন। কাছে ছিলেন, দূরে সরে গেলেন। কিন্তু ঠাকুরের আদেশ অমান্য করার উপায় নেই।

সারদা চলে গেলেন সেই চালাঘরে। তার সঙ্গে এবার একটি ঝি দেওয়া হল।

সেই ঘরেই ঠাকুরের জন্য রান্না করেন সারদা। এবার তাঁর কপাল খুলল। ঠাকুরের ঘরে খাবার নিয়ে যাবার অধিকার মিলল তাঁর।

বড় থালায় বড় বড় বাটি সাজিয়ে তিনি খাবার নিয়ে যান ঠাকুরের ঘরে। শাক চচ্চড়ি খাবার যাই হোক, ছোট বাটি হলে ঠাকুর রেগে যান। বলেন, আমি কি পাখি যে ঠুকরে ঠুকরে খাবো?

সারদার ভাণ্ডার—অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। মা রাঁধেন অতি যত্ন সহকারে

শাক চচ্চড়ি ব্যঞ্জন। ঠাকুরের খেয়ে বড় তৃপ্তি হয়। বলেন, তুমি না থাকলে আমাকে এমন পরিপাটী করে কে রেঁধে খাওয়াতো বল দেখি?

সারদা মনে মনে খুশী হল।

বলা নেই, কওয়া নেই, একদিন বিকেল বেলা ঠাকুর হঠাৎ গিয়ে হাজির হলেন সেই চালাঘরে। এমন ভাবে ঠাকুর কোন দিন যান না।

কিন্তু হঠাৎ এমন বৃষ্টি নামল, সেই বৃষ্টি আর থামে না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল, তবু বৃষ্টির বিরাম নেই।

ঠাকুর বললেন, কি দুর্যোগ!

সারদামণি মনে মনে ভাবলেন, আমার কপাল কি ভাল। ঠাকুরকে অনেকক্ষণ কাছে পেলাম।

শুধু কপাল ভালই নয়, যাকে বলে বরাত-জোর।

ঠাকুর বললেন, তা হলে রান্না চাপাও, খেয়েই যাই এখানে।

সারদামণি ভাবলেন, কি শুভক্ষণেই না আজ ঘুম থেকে উঠেছিলাম। তিনি যত্ন করে রাঁধলেন ঝোল আর ভাত। কাছে বসে খাওয়ালেন ঠাকুরকে।

নিজের ঘরে বসিয়ে ঠাকুরকে খাওয়ানোর এমন সুযোগ অনেক দিন পরে আজ জুটলো।

ঠাকুরের আমাশয় হয়েছে। তিনি কাহিল হয়ে পড়েছেন খুব। সারদামণি চালাঘরেই আছেন।

ঠাকুরের কাছে থেকে ডাক আসেনি, তাই যান নি তাঁর কাছে। শুধু প্রতীক্ষা করছেন কখন ডাক আসবে।

এমন সময় হঠাৎ কাশী না কোত্থেকে একটি মেয়ে এসে হাজির হল। সে লেগে গেল ঠাকুরের সেবায়।

সবাই অবাক্ মেয়েটির কাণ্ড কারখানা দেখে। মেয়েটি নিজেও অবাক্ হল যখন জানল ঠাকুরের বউ কাছাকাছিই রয়েছে। স্বামীর অসুখ অথচ স্ত্রী কাছে আসবে না এ কেমন ব্যাপার!

একদিন সন্ধ্যাবেলা মেয়েটি সারদাকে টানতে টানতে নিয়ে এল।

ঘোমটাতে সারদার মুখ ঢাকা। ঘরে এনেই মেয়েটি তাঁর মুখের ঘোমটা টেনে খুলে ফেলল।

কিন্তু তখনই ঘটল এক আশ্চর্য ব্যাপার! ঠাকুর বিছানার উপর বসে স্তব করতে শুরু করলেন। তুমি শক্তিস্বরূপিণী, পরমা আদ্যা প্রকৃতি...

সারদা আর মেয়েটি দুজনেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

চালাঘরে বড্ড গরম। এত গরম কি সহ্য হয়! সেখানে থেকে মা সারদামণিরই অসুখ করে গেল।

শম্ভু মল্লিক ডাক্তার বদ্যি আনলেন, চিকিৎসাও হল। কিন্তু অসুখ পুরোপুরি সারল না। সবাই বলল, স্থান পরিবর্তন করা দরকার।

ঠাকুর সারদাকে বললেন, সত্যি তোমার শরীর বড় খারাপ হয়ে গেছে যে। বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এসো। দেখো যদি তাতে কিছু সুফল হয়।

মা সারদা জয়রামবাটিতে রওনা হলেন।

শ্যামাসুন্দরী মেয়েকে দেখে আঁতকে উঠলেন—একি চেহারা হয়েছে রে তোর!

গরিব বিধবা মা। মেয়ের চিকিৎসা কি ভাবে করবেন! তা ছাড়া পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার বদ্যিই বা তেমন পাওয়া যায় কোথায়?

দিনে দিনে মায়ের অসুখ বাড়তেই লাগল। কঠিন আমাশয়, এ অসুখ সারে কি না সন্দেহ।

বাড়ির একটু দূরে কুলুপুকুর। সেখানেই বারে বারে শৌচে যেতে হয়। এতবার হাঁটাহাঁটি করতে করতেও পা ভেঙে আসে। শরীরে আর সয় না।

পুকুর পাড়েই শুয়ে রইলেন সারদা।

পুকুরের জলে নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠলেন। একি চেহারা হয়েছে তাঁর! এই অস্থিচর্মসার দেহ রেখে লাভ কি?

সারদা ঠিক করলেন পুকুরের জলে ডুবে মরবেন। কিন্তু মরতে

যাবেন এমন সময় একটি মেয়ে এগিয়ে এল। গাঁয়েরই মেয়ে হবে হয়তো। বলল, একি, তুমি এখানে কেন? বাড়ি চলো।

মেয়েটি তাঁকে বাড়ির দিকে নিয়ে চললো।

মরা আর হল না!

জয়রামবাটিতে আছে এক সিংহবাহিনীর মন্দির। তাতে দেবীমূর্তি নামেমাত্রই আছেন। মন্দিরের অবস্থা জীর্ণশীর্ণ। কেউ সেদিকে যায় না। লোকেরা ভুলেই গেছে সেই মন্দিরের কথা।

একদিন মা সারদার কি খেয়াল হল, চলে গেলেন সেই সিংহ-বাহিনীর মণ্ডপে।

নির্জন মন্দির, কোন লোকজন নেই তার আশেপাশে। সেখানে গিয়ে তিনি হত্যা দিলেন। বললেন, মা, হয় আমাকে রাখো, না হয় মেরে ফেলো।

কিছুক্ষণ মাটিতে পড়ে থাকার পর সারদার চোখ জুড়ে তন্দ্রা এল।

একি! সিংহবাহিনী নিজে এসে দেখা দিলেন। হাত ধরে টেনে তুললেন মা সারদাকে। বললেন, তুমি কেন পড়ে আছ গো? ওলতলার একটু মাটি নিয়ে খাও। তাতেই তোমার অসুখ সেরে যাবে।

ঘুম ভেঙে গেল সারদার। তিনি চমকে উঠলেন। সত্যি যে তিনি উঠে বসেছেন!

একি স্বপ্ন না সত্য? জননী সিংহবাহিনী আদেশ করেছেন তাঁকে!

মা সারদা ওলতলার মাটি তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তাঁর শরীরের শক্তি যেন ফিরে আসছে। জাদুমন্ত্রের মত যেন সব রোগ চলে যাচ্ছে তাঁর দেহ ছেড়ে।

এরপর সত্যি সুস্থ হয়ে উঠলেন মা সারদা।

দেখতে দেখতে নানাদিকে এই অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল। চারদিকে রব উঠে গেল, সারদামণি সিংহবাহিনীকে জাগিয়ে দিয়েছেন। দলে দলে লোক আসতে লাগল নানা জায়গা থেকে। সিংহবাহিনীর দয়ায় বহু লোক রোগমুক্ত হল। চারদিকে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল।

যে সিংহবাহিনীর মন্দিরের নাম কেউ মুখে আনত না, কেউ চিনত না, সেই মন্দির হয়ে উঠল বিখ্যাত।

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রমণির গঙ্গালাভ ঘটেছে। মা সারদা তখন জয়রামবাটিতে।

শুনে খুবই দুঃখ পেলেন সারদামণি। চন্দ্রমণি বড় ভালবাসতেন তাঁকে।

ভাবলেন দক্ষিণেশ্বরে চলে যাবেন। কিন্তু যাই যাই করেও যাওয়া হল না। ওদিকে ধরল তাঁকে ম্যালেরিয়া জ্বরে।

বড় বিচ্ছিরি এই ম্যালেরিয়া জ্বর। কম্প দিয়ে জ্বর আসে। ছাড়ে ঘাম দিয়ে। শুধু কি তাঁর! গাঁশুদ্ধু লোকের ম্যালেরিয়া।

জ্বর বেড়ে বেড়ে পেটের পিলে পর্যন্ত বেড়ে গেল।

সবাই বলে, পিলের দাগ দাও। পিলের দাগ ছাড়া এ কম্পজ্বর সারবে না। পেটের পিলেও কমবে না।

সবাই কয়াপাটের হাটতলায় গিয়ে পিলে দাগাতে লাগল।

সে এক বীভৎস ব্যাপার! রোগীকে চান করিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয় মাটিতে। তিন চারজন লোক তার হাত পা চেপে ধরে, যাতে সে যন্ত্রণায় না পালায়। তারপর হাতুড়ে জ্বলন্ত কুলকাঠ দিয়ে পেটের খানিকটা জায়গায় ঘষতে থাকে। রোগী যন্ত্রণায় চিৎকার করে। পুড়ে জায়গাটা লাল হয়ে যায় তারপর কালো দাগ পড়ে সেখানে।

শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞেস করলেন সারদাকে, যাবি পিলে দাগাতে?

সারদা বললেন, যাবো।

—কিন্তু খুব যে কষ্ট?

—হোক কষ্ট তবু আমি যাবো।

ম্যালেরিয়ার জন্য ঠাকুরও একবার পিলে দাগিয়েছিলেন।

ঠাকুর যদি কষ্ট সইতে পারেন তবে আমি পারবো না কেন?

মেয়ের যখন সম্মতি আছে তখন আর চিন্তা কি?

একদিন শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠেই মেয়েকে নিয়ে শ্যামাসুন্দরী কয়াপাটের হাটতলার দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

অনেকটা পথ। তবে গায়ে লাগে না। গাঁয়ের আরো অনেক লোক যাচ্ছে। তাদের সঙ্গেই তাঁরা চলতে লাগলেন।

কয়াপাটের হাটতলায় সেদিন বেশ ভিড়। সারদা চান করলেন। তাঁর মা বললেন হাতুড়েকে, বাবা, আমার মেয়েকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও।

তিন চারজন জোয়ান লোক এল সারদাকে ধরতে। সারদা বললেন, না, আমাকে ধরতে হবে না। আমি নিজেই চুপ করে শুয়ে থাকতে পারবো।

জ্বলন্ত কুলকাঠ দিয়ে পিলে দেগে দেওয়া হল সারদার। তিনি একটুও নড়লেন না। কোন কাতর শব্দও বের হল না তাঁর মুখ দিয়ে।

আশ্চর্য।

সবাই অবাক্ হয়ে ভাবল, ধন্য মেয়ে। কি সহ্যগুণ!

এমন সহ্যগুণ না থাকলে কি মা হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীমা ও রাধু

॥ ৮ ॥

বাড়ির কর্তা মারা গেলে কি সংসারের শৃঙ্খলা থাকে? গাছই যদি পড়ে যায় ডালপালাগুলো থাকবে কাকে আশ্রয় করে?

রামচন্দ্র মারা যাবার পর জয়রামবাটির সারদাদের সংসারের অবস্থা তাই হল। সব ছেলেরই বয়স অল্প। যৎসামান্য উপার্জন। রামচন্দ্র নিজে যজন-যাজনে যথেষ্ট উপার্জন করতেন, জমিজমার চাষ-আবাদও নিজে দেখাশোনা করতেন। ছেলেরা তা কিছুই পারে না।

শ্যামাসুন্দরী অতি কষ্টে সংসার চালান। সেজন্য তাঁকে খাটতেও হয় খুব। সারদামণি প্রাণপণে মাকে সাহায্য করেন।

গাঁয়ের বাঁড়ুজ্যেরা মস্ত ধনী। সেজন্য তাঁদের দেমাকও যথেষ্ট। শ্যামাসুন্দরী তাঁদের বাড়ি ধান ভেনে সামান্য কিছু পান। সারদামণিও যান ধান ভানার কাজে মাকে সাহায্য করতে। এমনি করে অতিকষ্টে দিন চলে।

গাঁয়ে জাঁকজমক করে কালীপূজা হয়। শ্যামাসুন্দরী পূজায় দেবার জন্য চাল তৈরি করলেন। নিজেদের সংসারের খরচ বাঁচিয়ে অতিকষ্টে সেই চাল জমিয়ে রাখলেন মা কালীর ভোগে দেবার জন্য।

কিন্তু কালীপূজার কর্তারা কি কারণে আড়াআড়ি করে শ্যামাসুন্দরীর চাল নিলেন না। তাতে শ্যামাসুন্দরীর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তিনি ঘরে বসে কাঁদতে লাগলেন। হায়রে, এত কষ্ট করে মায়ের পূজার জন্য চাল তৈরি করলুম, সে চাল ভোগে লাগল না?

সারদামণি বললেন, মা তুমি কাঁদছ কেন? মা কালী নিশ্চয়ই আমাদের দুঃখ বুঝবেন। আমাদের তো কোন দোষ নেই।

সেদিন রাত্রেই শ্যামাসুন্দরী স্বপ্ন দেখলেন—এক লালমুখী দেবী

পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন। শ্যামাসুন্দরীর গায়ে চাপড় দিয়ে বললেন, তুই কাঁদছিস কেন? কালীর চাল আমি খাব।

ঘুম থেকে উঠে শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞেস করলেন সারদাকে, লাল মুখ, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসা—এ কোন্ ঠাকুর রে সারদা?

সারদামণি বললেন, জগদ্ধাত্রী।

শ্যামাসুন্দরী বললেন, আমি জগদ্ধাত্রী পূজো করব।

সারদামণি বললেন, বেশ করো।

শ্যামাসুন্দরী পূজার আয়োজন করতে লাগলেন। কালীপূজোর জন্ম যে চাল তৈরী হয়েছে তাতে কুলোবে না। আরো চাল করতে হবে।

কিন্তু ক'দিন পরই শুরু হল বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি, ধান আর শুকোতে পারা যায় না। শ্যামাসুন্দরী আবার কাঁদতে লাগলেন, ধান যদি শুকোতে না পারি তবে পূজো করবো কি দিয়ে?

শেষে রোদ উঠল। শুধু তাদের বাড়িতেই রোদ। চারদিকে বৃষ্টি, রোদ শুধু একটি বাড়িতে। এ যেন এক আজব কাণ্ড!

ধান শুকোল, চাল তৈরী হল। পূজাও হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। গাঁসুদ্ধ লোক প্রসাদ পেল। যে চাল তৈরী হয়েছিল তাতে তার অর্ধেক লোকেরও প্রসাদ পাবার কথা নয়। অথচ গাঁসুদ্ধ লোকের হয়েও আরও রয়ে গেল।

বিধাতার কি বিচিত্র লীলা!

প্রতিমা বিসর্জনের সময় কানের একটি গহনা খুলে রাখলেন শ্যামাসুন্দরী। তারপর কানে কানে বলে দিলেন, মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি তোমার জন্য সমস্ত বছর ধরে সব যোগাড় করে রাখবো।

কিন্তু কি আর যোগাড় করবেন শ্যামাসুন্দরী। সংসারের খরচই কুলোয় না, সঞ্চয় করবেন কোত্থেকে?

দেখতে দেখতে কেটে গেল একটি বছর। আবার পূজোর সময় ঘনিয়ে এল। শ্যামাসুন্দরী বললেন সারদাকে, সারদা, তুই কিছু সাহায্য কর, পূজোটা সেরে ফেলি।

সারদামণি বললেন, একবার তো হল আবার কেন? অত লেঠার মধ্যে আমি যেতে পারব না মা।

শ্যামাসুন্দরী একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। পূজো কি তবে এবার করা যাবে না!

রাত্রে সারদা ঘুমিয়ে আছেন। স্বপ্নে তিনজন এসে হাজির। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে জয়া বিজয়া। তাঁরা বললেন, পূজো করবি না? তা হলে আমরা যাই?

না না, তোমরা যাবে কেন? আমি কি তোমাদের যেতে বলেছি? সারদামণি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন।

পরদিন থেকে লেগে গেলেন পূজার জিনিস সংগ্রহ করতে। মাকে বললেন, মা, পূজোর আয়োজন করতে থাকো। আমি যা সাহায্য করবার করবো।

শ্যামাসুন্দরী খুশী হলেন। মেয়ের তা হলে সুমতি হয়েছে।

উৎসাহের সঙ্গে পূজার আয়োজন চলতে লাগল।

মায়ের কৃপায় ভাল ভাবেই পূজো হল।

সেই থেকে প্রতি বছর পূজো হতে লাগল জয়রামবাটিতে।

মা সারদামণি প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পূজার সময় গ্রামে আসেন।

মায়ের এক ভক্ত ছেলে যোগীন। আছে ঠাকুরের আশ্রয়ে। কচি বয়েস। মাকে বড় ভালবাসে।

যখন যা পয়সা পায় মায়ের নামে জমিয়ে রাখে। এমন করে সে ছয়শো টাকা জমিয়েছে। তাই থেকে সে জগদ্ধাত্রী পূজার জন্য কাঠের বারকোশ, সিংহাসনের চৌকি সব কিছু কিনে দিল। তারপর তিনশো টাকা দিয়ে কিনে দিল তিন বিঘে জমি। সেই জমির আয়ে পূজো হবে বছর বছর।

মা সারদা নিশ্চিন্ত হলেন।

॥ ৯ ॥

বিয়ের দুদিন পরেই রাত্রিবেলায় গদাধর সারদার গা থেকে গয়না খুলে নিয়েছিলেন। লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে ধার করা গয়না।

সেদিন অবুঝ সারদা কেঁদেছিলেন।

সে কান্নার বেদনা কি জমা হয়ে ছিল এতদিন ঠাকুরের মনে?

একদিন ঠাকুর বললেন হৃদয়কে—ছাখ্ তো হৃদে, তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে?

ঠাকুর মাসে সাত টাকা করে পান মন্দির থেকে। নিজে তা স্পর্শ করেন না, সিন্দুকে গিয়ে জমা হয়। হৃদয়ই জমিয়ে রাখে।

গুনে ছাখ্ কত টাকা আছে।

হৃদয় গুনে বলল, তিন শো টাকা।

তোর মামীকে ভালো করে দু ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে। আর ডায়মন কাটা বালা দে একজোড়া।

হৃদয় অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল মামার দিকে। ঠাকুর বললেন, সত্যি বলছি। ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী, তাই সাজতে ভালবাসে।

গয়না তৈরী হল।

কিন্তু সে গয়না পরতে মা সারদার কি সংকোচ। তবু ঠাকুরের অনুরোধে পরতেই হল।

যে গয়না গা থেকে খুলে নেওয়া হয়েছিল বলে কান্না, এখন সে গয়না গায়ে তুলতে কান্না। সত্যি, কি আশ্চর্য!

সোনার অলংকার সারদার ভাল লাগে না।

অলংকারের কি অভাব আছে তাঁর? লজ্জা তাঁর অলংকার। সেবা, নিষ্ঠা, ভালবাসা, সারল্য, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা সবই তো মানুষের অলংকার। সেই অলংকারের গরবে গরবিনী মা সারদা।

বাইরের অলংকারের প্রয়োজন কি তার ?

মা সারদা প্রায়ই জয়রামবাটিতে থাকেন। তবু ঠাকুরের জন্য মন কেমন করে। তাই মাঝে মাঝে ঠাকুরের দিব্য সঙ্গলাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসেন।

ঠাকুর ও মার সম্পর্ক অতি বিচিত্র। যেন এ যুগের শিব-পার্বতী!

এমন কামগন্ধহীন, নিতান্ত প্রীতিপূর্ণ দাম্পত্যপ্রেম সংসারে আর কোথায় আছে? ঠাকুরের সামনে মা সারদা থাকেন সলজ্জ বধূটির মত, ঘোমটা মোচন করেন না কখনো।

হিন্দু কুলবধূর লজ্জাই যে ভূষণ। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে নহবত-খানায় অনেকদিন তিনি স্বামী, অন্যান্য ভক্তদের ও অতিথিদের সেবায় নিরত ছিলেন। কিন্তু অতি কম লোকই তাঁর দেখা পেত। রাত তিনটের পর যখন কেউ জাগত না, তখন প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি শেষ করে ঘরে ঢুকতেন আর বাইরে আসতেন না। সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগেই তাঁর পূজা, জপ, ধ্যান সব শেষ হয়ে যেত।

এমনই মা! লজ্জায় বিনীতা, বুদ্ধিতে নিপুণা আর সাহসে অটলা।

মায়ের সাহস নেই কে বলে! নইলে তিনি পায়ে হেঁটে আসতে পারতেন জয়রামবাটি থেকে দক্ষিণেশ্বরে? কখনো বা কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বর।

সাহস, শক্তি, ধৈর্য সবই আছে মায়ের। মা যে শক্তিময়ী।

একবার শ্যামাসুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে মা সারদা দক্ষিণেশ্বরে এলেন। ভাবলেন মাকে কিছুদিন সেখানে রাখবেন। কিন্তু এমন অবস্থা হল, রাখতে পারলেন না।

হৃদয় কি যে ব্যবহার করলে সেবার, আশ্চর্য! নিজের বাড়ি শিওর, তবু শিওরের মেয়ে শ্যামাসুন্দরীকে মোটে আমলই দিল না। বললে, তুমি এখানে এসেছ কেন? চলে যাও, এখানে কিছু হবে না।

মনে ভয়ানক ব্যথা পেলেন শ্যামাসুন্দরী। আমরা কি কারুর ভাগে

ভাগ বসাতে এসেছি? বললেন মেয়েকে, চল্‌ দেশে ফিরে যাই। এখানে কার কাছে তোকে রেখে যাব? যার কাছে তোকে রাখবো সে তো হৃদয়ের কথায় ওঠে বসে। চল্‌ যাই।

সারদামণি ফিরে চললেন মাকে নিয়ে। আশ্চর্য! রামকৃষ্ণ কোন প্রতিবাদ করলেন না। হৃদয়কেও কোন কথাটি বললেন না। যাবার সময় সারদামণি ভবতারিণীর দিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু বলে গেলেন, মাগো, এবার ঠাঁই দিলে না। আবার যদি কোনদিন আনাও তো এখানে আসব।

সারদামণি বুঝলেন হৃদয়ের মনে অহং বুদ্ধি জেগেছে। কর্তালি পেয়েছে বলে সে নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে। সাংসারিক কূটবুদ্ধি জেগে উঠেছে তার মনে।

এমন কূটবুদ্ধির মানুষ কি দক্ষিণেশ্বরে থাকতে পারে। বিশেষ করে ঠাকুর রয়েছেন এখানে। ভবতারিণী এখনো জাগ্রত।

হৃদয়ের ঠাঁই হলো না। তাকে ছাড়তেই হল দক্ষিণেশ্বর। সে চলে গেল একদিন।

কিছুদিন পরেই কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পান গিয়ে হাজির হল জয়রামবাটিতে। ঠাকুর তাকে পাঠিয়েছেন। হৃদয় চলে গেছে দক্ষিণেশ্বর থেকে। নতুন পূজারী হয়ে রামলাল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। ঠাকুরের ভারী কষ্ট হচ্ছে। কেউ তাঁর খোঁজখবর করে না। তাই বলে পাঠিয়েছেন ঠাকুর সারদাকে তাড়াতাড়ি যেতে।

এ খবর পাওয়ার পর কি সারদা আর বসে থাকতে পারেন? তিনি রওনা হলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য। তাঁকে ফিরে আসতে হল আবার। পড়ে গিয়ে ঠাকুরের হাত ভেঙেছে। ঠাকুর হিসেব করে দেখলেন বেস্পতিবারের বারবেলায় সারদা বাড়ি থেকে রওনা হয়েছেন, তার কিছুক্ষণ পরেই ঐ দুর্ঘটনা। তাই বললেন ঠাকুর, যাও, যাত্রা বদলে এসো।

একি ব্যাপার! আসতে না আসতেই বিদায়!

সারদাও যাবার জন্য তৈরী। কিন্তু ঠাকুর আবার কি বুঝে বললেন, আজ থাকো, কাল যেও।

একটি রাত থেকে সারদা ফিরে চললেন জয়রামবাটি।

কিছুদিন পর দিনক্ষণ দেখে আবার যাত্রা করলেন সারদামণি। এবার তাঁর সঙ্গী ঠাকুরের ভাইপো শিবরাম আর ভাইঝি লক্ষ্মী। গঙ্গাস্নানের যোগ পড়েছে। অনেকেই যাচ্ছে গঙ্গাস্নানে। তারাও কেউ কেউ সঙ্গী হল।

পায়ে হেঁটে যাওয়া। তাই লোক বেশী হলেই সুবিধা। পথে বিপদের ভয় আছে অনেক।

সবাই দল বেঁধে আরামবাগ হয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হল। আরামবাগ পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই তেলোভেলোর মাঠ।

ডাকাতের বিরাট আড্ডা সেই মাঠে। সেখানে আছে ডাকাতে-কালী। ডাকাতেরা কালীপূজার সময় নরবলি দেয়, তারপর বের হয় ডাকাতি করতে। কাজেই সে পথে যাতায়াত করতে ভয় জাগে সবার মনে। একা কেউ সাহস করে সে পথ দিয়ে হাঁটে না।

যাত্রীরা সবাই চলেছে জোরে পায়ে হেঁটে। সন্ধ্যা হবার আগেই পেরিয়ে যেতে হবে তেলোভেলোর মাঠ। নইলে কপালে কি বিপদ ঘটবে কে জানে?

সবাই তাড়া দিচ্ছে সারদাকে—চলো, পা চালিয়ে। হাঁটো তাড়াতাড়ি।

সারদা হেঁটে চলছিলেন প্রাণপণে। কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে কি আর পারা যায়? কিছুদূর গিয়েই পিছিয়ে পড়েন। আবার ছুটতে থাকেন পা চালিয়ে।

কিন্তু তর সইছে না যাত্রীদের। তারা বলছে—হাঁটতে না পারলে আমাদের সঙ্গে এসেছো কেন! তোমার জন্য কি আমরা ডাকাতের হাতে পড়বো?

কিন্তু সারদা আর পারছেন না। রোগে ভুগে ভুগে শরীর তাঁর কাহিল হয়ে গেছে। আগের মত হাঁটবার শক্তি নেই।

ওদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘনিয়ে আসছে। যতই অন্ধকার ঘনায় ততই সঙ্গীরা ব্যস্ত হয়। বিরক্ত হয় সারদার প্রতি। কেউ কেউ মন্তব্য করে, এবার নির্ঘাত ডাকাতের হাতে মরণ!

সারদা ভেবে দেখলেন, সত্যি তো! আমার জন্য কেন বিপদে পড়বে তারা! তাই বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও। আমি যাচ্ছি তোমাদের পেছনে পেছনে। যদি পারো তারকেশ্বর চটিতে আমার জন্য অপেক্ষা করো।

সঙ্গীরা আর পেছনের দিকে তাকালো না। তারা হেঁটে চললো সামনের দিকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে যে আর দেরি নেই।

সারদাও হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু সঙ্গীরা তখন তাঁকে ফেলে চলে গেছে অনেক দূরে। অন্ধকারে পথ দেখা যায় না। তবু হাঁটতে লাগলেন সারদা অনুমানে দিক্ লক্ষ্য করে।

কিন্তু দিক্ বুঝি সত্যি ভুল হয়ে গেল। আর ভুল হয়ে গেল এই তেলোভেলোর মাঠে এসে। দুর্ভোগ আর কাকে বলে?

তবু ভয় ছিল না সারদার! কিন্তু হঠাৎ থমকে গেলেন একটা গুরুগম্ভীর ডাক শুনে। সে ডাক মাঠ কাঁপিয়ে আসছে—

কে যায়? কে…?

ডাকাতের কণ্ঠের ডাক। সে ডাক শুনে বুক কেঁপে ওঠে সাহসী পুরুষেরও।

কিন্তু নারী হয়েও সারদা ভয় পেলেন না। জবাব দিলেন সঙ্গে সঙ্গে, তোমার মেয়ে গো!

লাফ মেরে এগিয়ে এল বাগদি ডাকাত। কালো দুর্দান্ত চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে লম্বা লাঠি।

কে তুই? কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল ভয়াল কর্কশ ধ্বনি।

তবু ভয় নেই সারদার মনে। তিনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন—আমি তোমার মেয়ে গো। যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বরে তোমার জামাইয়ের কাছে। আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে চলে গেছে আগে আগে। তুমি যদি আমাকে পৌঁছে দিয়ে এসো—

ডাকাত জিজ্ঞেস করল, কোথায় জামাই ? কি করে ?

সারদা বললেন, দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। পূজো করেন।

পায়ের মল খুলে ফেললেন সারদা। ডাকাতের হাতে দিয়ে বললেন —এটা নাও বাবা, আমাকে পৌঁছে দাও তাঁর কাছে।

এমন সময় সেখানে এসে পৌঁছে গেল ডাকাতের বউ। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—কে গো তুমি ?

আমি তোমার মেয়ে—সারদা। ডাকাত-বউয়ের হাত দুটো চেপে ধরলেন সারদামণি। বললেন, কি বিপদেই পড়েছিলুম মা, যদি তুমি ও বাবা না এসে পড়তে।

ডাকাত আর ডাকাত বউ যেন বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে। পায়ের মল দুটি সারদার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ডাকাত বলল—চল্ আমাদের সঙ্গে।

সারদা চলল, তাদের পিছু পিছু। গাঁয়ের এক ছোট্ট দোকানে গিয়ে তারা উঠল। মুড়ি মুড়কি কিনে দিল সারদাকে। তাই খেলেন সারদা। ডাকাত-বউ নিজের হাতে পেতে দিল বিছানা। বলল, আজ রাতটা এখানেই কাটা, এত রাতে আর যাবি কোথায় ?

ঘুমিয়ে পড়লেন সারদা। ডাকাত লাঠি হাতে সারা রাত পাহারা দিল জেগে জেগে।

ভোর হতেই আবার শুরু হল পথ চলা।

এবার সারদা আর একা নন, সঙ্গে তাঁর রাত্রের পাতানো ডাকাত মা বাবা।

পথে কড়াইশুঁটির ক্ষেত। কড়াইশুঁটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছোট্ট মেয়ের মত খেতে লাগলেন সারদামণি। কি তাঁর আনন্দ! ভয় যেন কোথায় চলে গেছে।

তারকেশ্বর পৌঁছতেই সঙ্গীদের সন্ধান পাওয়া গেল। সঙ্গীরাও সারদার সন্ধান পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। তারা ভাবতে পারেনি সারদাকে ফিরে পাবে। জিজ্ঞেস করল কৌতূহলী হয়ে, কোথায় ছিলে কাল রাতে ? সঙ্গে এরা কারা ?

সারদামণি বললেন, এরা আমার মা-বাবা। কাল রাতে যদি এরা না এসে পড়ত তা হলে কি বিপদই যে হত আমার।

এবার বিদায়ের পালা। বস্তিবাটির দিকে চলল যাত্রীর দল। বাগদি ডাকাত আর তার বউ কাঁদতে লাগল। সারদাও কাঁদতে লাগলেন। মেয়ে যেন বাপ-মার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে।

বিদায়ের মুহূর্তে ডাকাত বাবা বলল, মাগো, যদি পায়ের বেড়ি না থাকত আমার, তা হলে তোমাকে নিজেই দিয়ে আসতুম বাবার কাছে।

ডাকাত-মা ক্ষেত থেকে তুলে দিল কোঁচড়ভরতি কড়াইশুঁটি। বেঁধে দিল সারদার আঁচলে। বললে, মা, পথে খিদে পেলে খাস্।

ডাকাত মা-বাবার চোখের জল আর ফুরায় না। সারদা কাঁদতে কাঁদতে বলল, সময় পেলে এসো তোমরা ঠাকুরের কাছে।

সারদা সঙ্গীদের সঙ্গে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে চলে গেলেন। ডাকাত আর তার বউ তাকিয়ে রইল সেই পথের দিকে। তারপর তারা চলতে লাগল। যতদূর দেখা যায় ফিরে ফিরে তাকায় আর তারা কাঁদে।

॥ ১০ ॥

ঠাকুর বললেন সারদাকে, তোমায় দীক্ষা নিতে হবে।

সারদামণি বললেন, বেশ আমাকে দীক্ষা দাও।

ঠাকুর বললেন, আমি দেবো কি গো। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে তোমার পূর্ণানন্দের কাছে। আমি তাকে বলে দিয়েছি।

মা সারদা স্বামী পূর্ণানন্দের কাছ থেকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। শেষে ঠাকুরও তাঁর জিহ্বায় একটি মন্ত্র লিখে দিলেন। এঁকে দিলেন কুলকুণ্ডলিনী ষটচক্র।

নহবতের পশ্চিম বারান্দায় বসে দক্ষিণ দিকে ঠাকুরের দিকে মুখ করে জপ করেন সারদা। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান—আমার চরিত্র যেন নিষ্কলঙ্ক হয়।

যোগেন-মা বড় ভক্তিমতি। ঠাকুরের প্রতি তাঁর অসীম ভক্তি।

সারদামণি একদিন বললেন যোগেন-মাকে, ওঁকে আমার কথা একটু বলতে পারো?

যোগেন-মা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি বলবো?

সারদা বললেন, যাতে আমার একটু ভাব-টাব হয়।

যোগেন-মা বললেন, বেশ বলবো, এ আবার এমন কি কঠিন কাজ?

একদিন সকালবেলা ঠাকুর বসে আছেন তক্তপোশে। যোগেন-মা প্রণাম করে কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন—কি খবর?

যোগেন-মা জানালেন সারদার মনের অভিপ্রায়।

ঠাকুর সহসা গম্ভীর হয়ে গেলেন। চোখে মুখে ফুটে উঠল উদাসীনতার ভাব।

যোগেন-মা আর কিছু বলবার সাহস পেলেন না। কোন রকমে প্রণাম করে সরে এলেন সেখান থেকে।

ফিরে এসে দেখেন মার ঘরের দরজা বন্ধ। মা সারদা পূজায় বসেছেন। দরজা একটু ফাঁক করে দেখলেন যোগেন-মা। একি! সারদা হাসছেন খিলখিল করে। আবার কাঁদছেন। হাসি কান্নার একি সমন্বয়। একটু পরেই হাসিও নেই, কান্নাও নেই—চোখ বুজে ভাবে তন্ময়।

দরজা সন্তর্পণে বন্ধ করে দিয়ে যোগেন-মা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর মায়ের পূজা শেষ হল। ঘরে ঢুকলেন যোগেন-মা। বললেন, কি মা, তোমার নাকি ভাব হয় না? ঠাকুরের কাছ থেকে আবার ভাব নেওয়া শিখতে চাইছিলে কেন?

মা সারদা হাসলেন একটু। লজ্জা মেশানো হাসি। কোন কথা বললেন না।

ঠাকুর কোনকালে মা সারদাকে ভাবসমাধি শেখান নি। গভীর তত্ত্বকথা শোনান নি কখনো। মা যদি গভীর সমাধি হয়ে লীন হয়ে যান!

মা একবার রয়েছেন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। যোগেন-মা ও গোলাপ-মা জপ করছেন। হঠাৎ মায়ের কণ্ঠ শোনা গেল, ওরে যোগেন, আমার হাত কই, পা কই?

যোগেন-মা ও গোলাপ-মা ছুটে এলেন। কিন্তু মা তখন সমাধিস্থ। যখন সমাধি ভাঙল তখন শুরু হল আবার আক্ষেপ, আমার হাত কই, পা কই?

যখন মন ভাবরাজ্যে চলে যায়, তখন স্থূলবুদ্ধি থাকে না। মা তখন চলে গেছেন অনেক উচ্চমার্গে।

যোগেন-মা ও গোলাপ-মা হাত পা টিপে টিপে দেখাতে লাগলো সারদাকে—এই তো পা, এই তো হাত!

এই কি নির্বিকল্প সমাধি? তা যদি হয়ে থাকে মা এই সমাধি পেলেন কোত্থেকে? ঠাকুর দিয়েছেন কি? না, ঠাকুর দেন নি।

মা সারদা যে স্বতঃসিদ্ধা!

একদিন সেই বাগদি-ডাকাত আর তার বউ এসে হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে।

এসে খুঁজতে লাগল, আমাদের মেয়ে কোথায়? কোথায় আমাদের জামাই?

অবাক্ হয়ে সবাই জিজ্ঞেস করল, কে তোমাদের মেয়ে, কে তোমাদের জামাই গো?

তারা বলল, সেই যে আমাদের মেয়ে, হেঁটে হেঁটে আসছিল দক্ষিণেশ্বরে।

সবাই এবার বুঝতে পারল কাকে খুঁজছে তারা। তাদের নিয়ে হাজির করল মা সারদার কাছে।

ডাকাত আর ডাকাতের বউ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে নাড়ু আর মোয়া। তাই তারা খুলে দিল মাকে।

আমার কথা তোমাদের মনে আছে বাবা। জিজ্ঞেস করলেন সারদা।

মনে থাকবে না? তুই তো সাধারণ মেয়ে নস্। তোকে যে আমরা কালীরূপে দেখেছিলুম।

সে কি গো? হাসলেন সারদা।

না মা, আমরা সত্যি দেখলুম। আমরা পাপী বলে তুই রূপ গোপন করেছিস।

কি জানি বাপু, আমি তো কিছু জানি নি।

জামাই কোথায়? জামাইকে দেখবো। ডাকাত ও ডাকাত-বউ দুজনেই আবদার ধরল।

নিয়ে যাওয়া হল তাদের ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরকে দেখে গড় হয়ে প্রণাম করল তারা। এ যে সত্যি শিব গো! মা কালী আর শিব। আমরা কি মিথ্যা দেখেছি!

তাদের হাতের নাড়ু মোয়া ঠাকুরও খেলেন। খেয়ে তাঁর কি আনন্দ ?

বিদায় নেবার সময় সারদা বললেন, আবার এসো বাবা। মাকে নিয়ে আবার এসো।

বিদায়ের সময় সবার চোখেই অশ্রু।

ঠাকুর একদিন বললেন সারদাকে, তুমি দীক্ষা দাও সারদাপ্রসন্নকে।

আমি দীক্ষা দেব ? চমকে উঠলেন মা !

হ্যাঁ। তোমার অসাধ্য কি আছে ?

মাকে দীক্ষা দিতেই হল। ঘোমটা দেওয়া মুখ। তারই মধ্যে নহবতের ঘরে দীক্ষা দিলেন সারদাপ্রসন্নকে। সারদাপ্রসন্ন হলেন স্বামী ত্রিগুণানন্দ।

আর একটি ছেলেকে দীক্ষা দিয়েছিলেন মা। তাঁর নাম যোগেন। দীক্ষালাভ করে তাঁর নাম হয়েছিল যোগানন্দ।

যোগানন্দ মাকে খুব ভালবাসতেন, ভক্তি করতেন। মা ছাড়া কিছু তিনি জানতেন না।

বিয়ে করার পর সংসার ত্যাগ করেছিলেন যোগেন। তাঁর ঘোরতর অসুখের সময়ে তাঁর স্ত্রীকে মা সারদা এনেছিলেন কাছে। যোগীন কিছুতেই স্ত্রীর হাতে সেবা নেবেন না। মায়ের অনুরোধে শেষে তাঁকে স্ত্রীর সেবা নিতে হল। মা বুঝেছিলেন, যোগীনের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাই বললেন, যোগীন, স্ত্রীর সঙ্গে দু চারটি কথা বলো, তাকে উপদেশ দাও।

আমি ওসব পারবো না। যা উপদেশ দেবার আপনি দিন। যোগানন্দ স্ত্রীর দিকে ভাল করে তাকালেনও না।

যোগানন্দের মৃত্যু হলে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কড়ি খসল, এবার ধীরে ধীরে বর্গাও সব খসে পড়বে। মা সারদা বললেন, বাড়ির একখানা ইট খসল, এবারে সব যাবে।

যোগানন্দ একখানা লেপ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন মাকে। সেটা

ব্যবহার করতে করতে খুব পুরনো হয়ে গেল। অনেকে বললে, তুলো পিঁজে নতুন কাপড় দিয়ে ওটাকে তৈরি করিয়ে নিন। তাহলেই দিব্যি নতুন লেপ হয়ে যাবে।

মা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, না, ওটাকে বদলে দিয়ে কাজ নেই। এই লেপ যোগীন দিয়েছিল, দেখলেই যোগীনকে মনে পড়ে।

স্বামী যোগানন্দ ছিলেন ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষ। মা বলেছেন, কৃষ্ণ-সখা গাণ্ডীবী ছিলেন তিনি। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য নরলীলার সাথী। তাঁর দেহত্যাগের পর স্বামী সারদানন্দ প্রায় একুশ বছর একনিষ্ঠভাবে মায়ের সেবা করেছেন। মা বলতেন—শরৎ আর যোগীন এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।

মা সারদা।

মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনপথের মহানায়িকা।

দুপুরের সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে একান্তমনে জপের মালাটি হাতে নিয়ে ধ্যানসাগরে ডুবে যেতেন। তারপর রামায়ণ মহাভারতের মহাকাব্যে মনকে করতেন নিমজ্জিত।

সন্ধ্যাকালে মন্দিরে বেজে উঠতো আরতির ঘণ্টাধ্বনি। সেই ধ্বনি ভাগীরথীর জলতরঙ্গে কল্লোল তুলত। আর জননী সারদা নহবতের বারান্দায় ধ্যানে বসতেন জীবের কল্যাণে।

কল্যাণময়ী মা সারদা।

॥ ১১ ॥

লক্ষ্মীনারায়ণ নামে এক ধনী মারোয়াড়ী এল ঠাকুরকে দেখতে। দেখে কি যে তাঁর মনে ভাব হল, সেই জানে। বলল, বাবা, তোমাকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছি, তোমার সেবার জন্য।

ঠাকুরের পিঠে যেন লাঠির ঘা পড়ল। কিছুক্ষণ রইলেন চুপ করে। তারপর বললেন, অমন কথা মুখে এনো না। যদি আনো তা হলে আর কখনো এসো না এখানে।

লক্ষ্মীনারায়ণ অবাক্‌। এত টাকা সাধলে কেউ নেয় না, একি হতে পারে? আবার সাধলে নিশ্চয়ই নেবে। তাই আবার বলে, বাবা, নাও এই টাকা, আমি খুশী হয়ে দিচ্ছি।

রেগে উঠলেন রামকৃষ্ণ। না না, ও টাকা আমার নেওয়ার উপায় নেই, ছোঁয়ার উপায় নেই।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। ঠাকুর আমার টাকা নিতে চান না কেন? বিষণ্ণভাবে বলল, তাহলে যে আমার মনে ভারী কষ্ট হবে ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, যাও, তোমার মায়ের কাছে যাও। তার যদি কোন দরকার থাকে তবে সে নিক।

লক্ষ্মীনারায়ণ মা সারদার কাছে যাবে বলে ঠিক করল। তার আগে খবর গেল মার কাছে, এক মারোয়াড়ী দশ হাজার টাকা তাঁকে দান করতে চায়। ঠাকুর নেন নি, তাই তাকে টাকাটা রাখতে বলেছেন।

মা সারদা বললেন, না, তা কি করে হয়? উনি নেন নি, আমি নেব কি করে। আমার নেওয়া আর ওঁর নেওয়া একই কথা। আমার কাছে থাকলে তো ওঁর কাজেই খরচ হবে।

ঠাকুর খুশী হলেন সারদার জবাব শুনে। বললেন, ও আমি
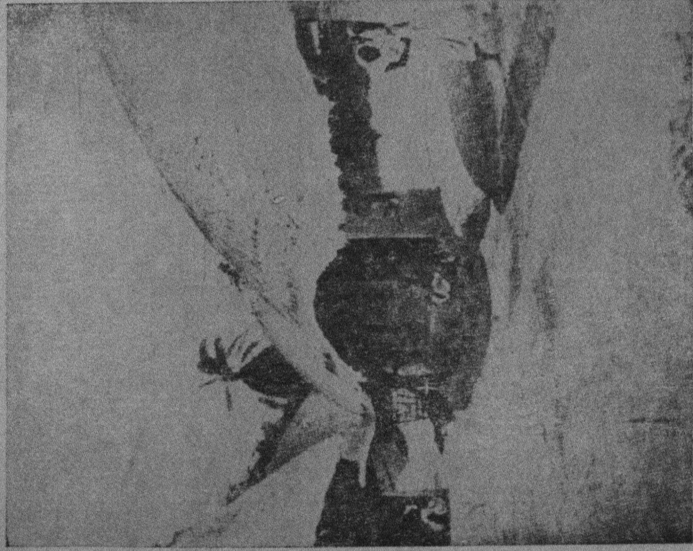
শ্রীশ্রীমার পিত্রালয় জয়রামবাটী
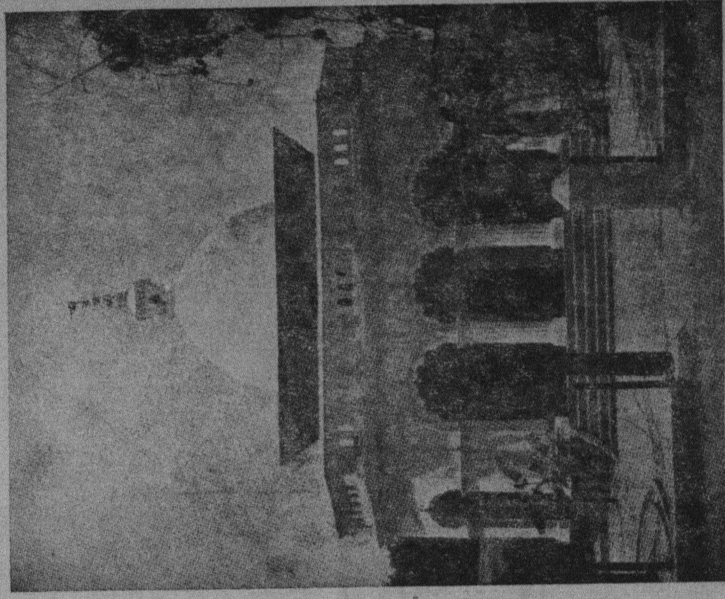
শ্রীশ্রীমার জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দির

জানতুম। আমি শুধু পরীক্ষা করে দেখলুম মাত্র। ও কি যে সে? ও মহাশক্তি, মহাবুদ্ধিমতী।

পানিহাটিতে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে বৈষ্ণবদের এক বড় মহোৎসব হয়।

ঠাকুর যান আর সঙ্গে যায় সব ভক্তের দল। মেয়ে পুরুষ অনেকেই এবার যাবে। চারখানা পানসি ভাড়া করা হয়েছে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

মা সারদার যাবার খুব ইচ্ছা হল। কিন্তু নিজে কিছু বলতে পারলেন না ঠাকুরকে। একজন স্ত্রী-ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, মা যাবেন আমাদের সঙ্গে?

ঠাকুর কোন উৎসাহ দেখালেন না। অনেকটা উদাসীনের মতই বললেন, যদি ইচ্ছা হয় তো চলুক।

সারদা মনের ভেতর সাড়া পেলেন না। ঠাকুর মন খুলে তাঁকে যাবার অনুমতি দেননি। তাই ভাবলেন, দরকার নেই গিয়ে। সঙ্গিনীদের বললেন. অনেক ভিড় হবে, অত ভিড়ে আমার যাবার ইচ্ছা নেই।

ঠাকুর গেলেন। সারদা রয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। প্রবল ইচ্ছা এক মুহূর্তে দমন করে ফেললেন সারদা।

ফিরবার সময় ঠাকুর বললেন, ও যায়নি, না গিয়ে ভালই করেছে। ও অশেষ বুদ্ধিমতী।

ঠাকুরের এই কথার কোন অর্থ বুঝতে পারল না তাঁর ভক্তের দল। তারা তাকিয়ে রইল ঠাকুরের মুখের দিকে। ঠাকুর বললেন, এমনিতে তোমরা যখন আমার সঙ্গে যাও তখন লোকেরা বলে, পরমহংসের ফৌজ চলেছে। এখন ও যদি সঙ্গে থাকতো তা হলে বলত, ঐ দেখ হংস-হংসী!

স্বামীর সেবায় সারদার যেন দশ হাত! এক হাতে দশ হাতের

কাজ করেন মা। ঠাকুরের পদসেবা করেন, স্নানের আগে কখনো গায়ে তেল মাখিয়ে দেন। ঠাকুর কোন্ দিন কি খাবার খাবেন তার খোঁজ নিয়ে ঠিক ঠিক সেই খাবারটি তৈরি করে দেন।

ঠাকুরের ভক্তরাও প্রসাদ পায় মাঝে মাঝে। তখন আবার ভিন্ন রকম রান্না হয়।

একবার মা হিন্দুর সংস্কারের বশবর্তী হয়ে তিনদিন রেঁধে দিতে পারেননি। কারণ এ অবস্থায় ঠাকুর-দেবতা বা গুরুজনকে কিছু তৈরি করে দেওয়া চলে না।

সেই তিন দিন ঠাকুরকে অন্যের হাতে রান্না খেতে হল। কিন্তু খেয়ে তাঁর রুচি হল না। তার ওপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ঠাকুর তখন বললেন সারদাকে, তুমি ঐ পুরনো সংস্কার ছাড়ো। দেহের রক্ত, মাংস, হাড় এসব কি কখনো অশুদ্ধ হয়? মনের বিকার দূর হলে সব অবস্থায় সব কিছু কাজ করা চলে। ওতে কোন দোষ নেই।

ঠাকুর যখন বলেছেন দোষ নেই, তখন আর বাধা কি? মার মনের ধারণা বদলে গেল। ঐ অবস্থায় ঠাকুরকে তিনি রেঁধে দিতেন। ঠাকুরও খেয়ে তৃপ্তি পেতেন খুব।

এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসে রোজ সারদার কাছে। চুপে চুপে আসে। এসে গল্প জুড়ে দেয়। দুপুরের পর আসে, ফেরে বিকেল গড়িয়ে গেলে।

ঠাকুর কিন্তু বৃদ্ধাকে মোটে দেখতে পারেন না। যৌবনে ও খুব খারাপ মেয়েমানুষ ছিল। সে জন্যই ওর ওপর ঠাকুরের এত বিরাগ কিনা কে জানে। তাই বললেন সারদাকে, ওকে কেন আসতে দাও।

সারদা কিন্তু মুখ খুলে বৃদ্ধাকে কিছু বলেন না। বৃদ্ধা রোজ আসে। মাঝে মাঝে মা তাকে খাবারও দেন। সবাই ভাবে, এটা কেমন ধারা! মেয়েদের ওপর কেমন যেন মার এক দুর্বলতা। কিন্তু তারা জানে না, ওটা দুর্বলতা নয়—স্নেহ মায়া।

এক কুলবধূ একদিন এল মার কাছে। সে বিপথে পা দিয়েছে। অন্তরে তার অনুতাপ, চোখে জল।

বাইরে এককোণে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। মায়ের কাছে আসবে সে সাহস পর্যন্ত নেই। মা দেখতে পেয়ে তাকে ডাকলেন।

বউটির মনে তবু সংকোচ। মা বললেন, এসো, লজ্জা কি!

বউটি ধীরে ধীরে পা ফেলে কাছে এল।

মা বললেন, বসো।

বউটি সংকোচে অনেক দূরে সরে বসল। মা তাকে কাছে এনে বসালেন।

কিন্তু কাছে এসে বসতেই বউটির চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। মা বললেন, কেঁদো না। পাপ যখন বুঝতে পেরেছ তখন আর পাপ নেই! এসো তোমাকে মন্ত্র দেবো।

বউটি চমকে উঠল সেকথা শুনে। মায়ের এত দয়া তার ওপর!

পরশমণি স্পর্শে লোহাও সোনা হয়। বউটিরও তাই হল। মায়ের কাছে মন্ত্র নিয়ে সে হয়ে গেল অন্য মানুষ। পরম ভক্তিমতী এক রমণী।

॥ ১২ ॥

১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে ঠাকুরের অসুখ হল। গল-রোগ।

জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই অসুখ নিয়েই গেলেন পানিহাটি উৎসবে। তাতে রোগ আরো বেড়ে গেল। একদিন রক্ত পড়তে লাগল গলা দিয়ে।

ভক্তরা ঘাবড়ে গেল। ঠিক করল কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবে। ঠাকুর রাজী হলেন।

শ্যামপুকুর স্ট্রীটে একটি বাড়ি ভাড়া করে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। সারদা রইলেন দক্ষিণেশ্বরেই। তাঁকে কেউ যেতেও বলল না, তাই তিনি গেলেন না।

ঠাকুর নেই, মনে হয় সারা দক্ষিণেশ্বরটাই বুঝি ফাঁকা হয়ে গেছে। সারদামণি নিঃসঙ্গ।

একদিন রাত্রিবেলায় বকুলতলার ঘাটে গেছেন সারদামণি। চারদিকে ঘোর অন্ধকার, হাতে আলো নেই। ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেছেন, হঠাৎ কিসের উপর যেন পা পড়ল।

পায়ে লাগল কাঁটা, গাটাও কাঁটা দিয়ে উঠল।

হঠাৎ পায়ের তলা থেকে জীবটা লাফিয়ে পড়ল গঙ্গায়। সারদা বুঝতে পারলেন একটা কুমির। রক্ষা কুমিরটা লাফিয়ে পড়েছে, নইলে কি হত কে জানে।

ওদিকে শ্যামপুকুরে ঠাকুরের চিকিৎসা চলতে লাগল। প্রথমে চলল কবিরাজী। তাতে কোন ফল হল না। তখন শুরু হল ডাক্তারী। ঠাকুর এলোপ্যাথি পছন্দ করেন না। তাই মহেন্দ্র সরকারকে ডাকা হল। মহেন্দ্র সরকার নাম-করা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। তাঁর এক ফোঁটা ওষুধে নাকি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও সারে।

মহেন্দ্র ডাক্তার এসে ওষুধ দিলেন। কিন্তু শুধু ওষুধ দিলেই তো হবে না। সেবাযত্নও রীতিমত করতে হবে। ওষুধপথ্য সবই ঠিকমত খাওয়াতে হবে।

কিন্তু পুরুষ মানুষেরা কি এসব পারে? তা ছাড়া সব মেয়েরাও এসব পারে না।

ভক্তরা ঠিক করলে মাকে নিয়ে আসবে। ঠাকুরকে সে কথা জানানো হল। ঠাকুর শুনে বললেন, আসবে তো, কিন্তু এখানে থাকবে কোথায়? এখানে এসে তার ঘোমটা ঘুচে যাবে না তো? তা ছাড়া এখানে ওর কষ্টও হবে খুব।

কষ্ট! স্বামীর সেবা করতে কেউ কষ্টের কথা ভাবে?

মা খবর পেয়েই ছুটে এলেন। ঘর-দোরের ভাল ব্যবস্থা নেই, তবু তার মধ্যেই মানিয়ে নিলেন নিজেকে।

দোতলায় ঠাকুরের ঘর, পশ্চিম কোণের দিকে মার থাকবার জায়গা। তেতলার ছাতের দরজার পাশে ছোট্ট একটু ঘেরা চাতাল আছে, মা কিন্তু সেখানেই থাকেন বেশির ভাগ সময়।

রাত তিনটের সময় ওঠা তাঁর চিরকালের অভ্যাস। এখানেও তাই করতে লাগলেন। বাড়িতে একটি মাত্র কল চৌবাচ্চা, তাই রাত থাকতে উঠে স্নানাদি না সেরে নিলে খুবই অসুবিধা। স্নান সেরে গিয়ে ঢোকেন সেই চাতালের ঘরে। সেখানে থেকেই ঠাকুরের পথ্যাদি তৈরি করেন। তা ছাড়া যখন যা দরকার তাও করেন।

ঠাকুরের অনেক ভক্ত সেই বাড়িতে আছে, তা ছাড়াও নিত্য যাতায়াত করে অসংখ্য ভক্ত। মা বিশেষ কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। বুড়ো গোপাল আর লাটু—এ দুজনের সঙ্গেই একটু কথাবার্তা বলেন।

নিজের হাতে ঠাকুরের পথ্য তৈরি করেন। লাটু বা বুড়ো গোপাল এসে নিয়ে যায়। মার বড় সাধ হয় ঠাকুরকে নিজের হাতে খাওয়ান। মাঝে মাঝে সেই সুযোগ অবশ্য এসে যায়। বুড়ো গোপাল আর লাটু

লোক সরিয়ে দেয় ঘর থেকে। মা কাছটিতে বসে যত্ন করে ঠাকুরকে খাইয়ে দেন।

কিন্তু কোন কোন দিন ভক্তদের এত ভিড় থাকে যে সরানো যায় না। সেদিন মার মনে বড় দুঃখ হয়। কিন্তু দুঃখ করেই বা লাভ কি? মা ভাবেন, ঠাকুর তো আমার একলার নয়, ঠাকুর যে সকলের।

এত চিকিৎসা, এত আদর-যত্ন—তাতেও কোন ফল হল না। অসুখ বেড়েই চলতে লাগল।

অনেকেই বলল, ঠাকুরকে কোথাও একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলে ভাল হয়। চিকিৎসকেরাও তাই বললেন। তখন কলকাতার একটু বাইরে ফাঁকা জায়গায় বাড়ি খোঁজাখুজি চলতে লাগল।

পাওয়াও গেল। কাশীপুরে গোপাল ঘোষের বাগানবাড়ি। বাড়িটা খুবই ফাঁকা, চারদিকে খোলা মাঠ। তবে ভাড়া বেশী, আশি টাকা।

ভক্তদের মন নিরুৎসাহে ভরে উঠলো। এত টাকা ভাড়া কি করে চালানো যাবে?

সুরেন মিত্তির বললেন, ঐ বাড়িই ভাড়া করো। ভাড়া আমি দেবো।

বাড়ি ঠিক হয়ে গেল। অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হল কাশীপুরের বাগানবাড়িতে।

চারদিকে বাগান। দোতলা বাড়ি। উপরের বড় ঘরে ঠাকুরের বিছানা। দক্ষিণে ছোট একটি ঘেরা ছাদ। সেখানে ঠাকুর সকাল বিকাল একটু হাঁটেন, কখনো বা বসেন।

মা থাকেন নীচের পুব দিকের ঘরে। মার সঙ্গে আছে লক্ষ্মী। সে নানা কাজে মাকে সাহায্য করে, থাকেও মায়ের ঘরে।

ডাক্তারের নির্দেশমত পথ্য তৈরি করতে হয়। মা তাই করেন আর খাইয়ে দিয়ে আসেন নিজের হাতে। কিন্তু সারাটি সময় কাটে তাঁর ব্যাকুলতায়—আর আকুল প্রার্থনায়। ঠাকুরকে ভালো করে দাও ভগবান—ঠাকুরকে বাঁচিয়ে রাখো।

ঠাকুরের অসুখ বেড়েই চলল। দর্শনার্থীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। ঠাকুরের অসুখের খবর শুনে লোক আসতে লাগলো দূর দূর থেকে।

কিন্তু এমন হলে ঠাকুরের যে কষ্ট হবে খুব। তাঁর অসুখ আরও বেড়ে যাবে। তাই তাঁর ঘরে লোকের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হল। যারা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করে তাদের ছাড়া কাউকে ঘরে যেতে দেওয়া হল না।

অনেকের ধারণা হল, ভক্ত ও সাধারণ মানুষের রোগ হরণ করে ঠাকুর নিজেই রোগ টেনে নিয়েছেন নিজের শরীরে। সেই কারণেই তাঁর এই দুরারোগ্য ব্যাধি। কাজেই নজর রাখা হল কেউ যেন তাঁকে স্পর্শ না করে।

অগণিত ভক্তের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হল। তাঁরা ঠাকুরকে দর্শন থেকে হল বঞ্চিত।

কিন্তু ভক্তদের আনাগোনার বিরাম নেই। তারা আসে, জড়ো হয় বাগানবাড়ির মাঠে।

একদিন বিকেলে গিরিশ ঘোষ এবং আরও অনেক ভক্তরা বাগানে বসে আছেন। ঠাকুরের কি খেয়াল হল, ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন। এগিয়ে গেলেন ভক্তদের দিকে। কল্পতরু হলেন তিনি আজ। সব ভক্তদের নিজেই স্পর্শ করলেন। তাদের বুকে হাত দিয়ে বললেন, চৈতন্য হোক।

ভক্তদের সুপ্ত আধ্যাত্মশক্তি জাগিয়ে দিলেন ঠাকুর।

কিন্তু বহু মানুষের জন্মজন্মান্তরের রোগতাপ টেনে নিয়েছেন ঠাকুর। তাঁর রোগ কি সারতে পারে? তাই বুঝি ক্রমে বেড়েই চলল। গলার ভিতরের ঘা বাইরেও দেখা দিল।

মা সারদা নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলেন না। কাশীপুর থেকে ছুটে এলেন তারকেশ্বরে। তারকেশ্বরে মন্দিরে এসে হত্যা দিয়ে রইলেন।

কিন্তু হঠাৎ যেন কি হল। অনেক রাতে কি একটা শব্দ শুনে

সারদা জেগে উঠলেন। তাঁর মনে হল কে যেন বলছে, এ সংসারে কে কার? এ জগতে কে কার স্বামী? কার জন্য নিজের জীবন দিতে বসেছ?

সব মায়া কেটে গিয়ে বৈরাগ্য এসে গেল মা সারদার মনে। তিনি উঠে পড়লেন। ফিরে এলেন কাশীপুরে। ঠাকুর যেন অন্তর্যামী। মাকে দেখে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, কিগো, কিছু সুবিধা হল?

মা মাথা নীচু করে রইলেন। তা দেখে আবার হাসলেন ঠাকুর। বললেন, জানি, কিছু হবে না।

কিন্তু সারদার মন যে শান্ত হয় না। তিনি নিরম্বু উপবাস করে একে একে দুদিন কাটিয়ে দিলেন। দেহ ক্ষীণ হয়ে গেল, কণ্ঠ গেল শুকিয়ে। অন্তর থেকে তবু কোন নির্দেশ পেলেন না। দেখতে পেলেন না ঠাকুরের রোগের উপশমের কোন লক্ষণ।

ছুটে গেলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে। মা কালীকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু একি! চমকে উঠলেন সারদামণি। মায়ের নিজের গলাতেই যে ঘা!

ছুটে চলে এলেন আবার কাশীপুরের বাগানবাড়িতে। নীরবে কাঁদতে বসলেন। সে কি কান্না।

* * * * *

ঠাকুর খুবই অসুস্থ। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। যদিও বা ওঠেন, হাঁটতে পারেন না মোটেই। এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

সন্ধ্যাবেলা। নরেন, লাটু, রাখাল, নিরঞ্জন বসে আছেন বাগানে। বাগানের ওপাশে আছে একটা খেজুর গাছ। তাতে কলসী টাঙানো আছে। সেই কলসীতে জমছে টুপ টুপ করে খেজুরের রস। তাঁরা ঠিক করলেন রস চুরি করে খাবেন।

আর একটু সন্ধ্যা হোক। অন্ধকার ঘনিয়ে আসুক তবেই তাঁরা যাবেন খেজুর গাছের তলায়।

মা বসে আছেন তাঁর ঘরে। এমন সময় দেখতে পেলেন ঠাকুর তরতর করে নীচে নেমে আসছেন। নেমেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। একি ব্যাপার? যিনি বিছানা থেকে উঠতে পারেন না, তিনি অমন করে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারেন! নিশ্চয়ই দেখতে ভুল হয়েছে!

মা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন উপরে। দেখলেন ঠাকুর তাঁর ঘরে নেই! এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করলেন, কোথাও নেই। আবার, নেমে এলেন নীচে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। ঠাকুরকে দেখতে না পেয়ে ঢুকলেন গিয়ে নিজের ঘরে। ভাবতে লাগলেন কি করবেন।

এমন সময় আবার দেখলেন, ঠাকুর উপরে উঠে যাচ্ছেন। যেমন করে তাড়াতাড়ি নেমে এসেছিলেন তেমনি করে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মা আবার উঠে গেলেন উপরে। গিয়ে দেখলেন ঠাকুর বিছানায় শুয়ে আছেন।

কিছু আর জিজ্ঞেস করলেন না সারদা দেবী। চুপি চুপি চলে এলেন নিজের ঘরে। পরের দিন পথ্য খাওয়াবার সময় মা কথাটা পাড়লেন।

ঠাকুর বললেন, ও কিছু নয়, তুমি ভুল দেখেছ। রেঁধে রেঁধে তোমার মাথা গরম হয়েছে।

কিন্তু কিছুতেই ছাড়বেন না সারদা দেবী। তিনি বললেন, আমি নিজের চোখে দেখলুম যে।

ঠাকুর বললেন, তুমি দেখে ফেলেছ নাকি? ছেলেদের কথা আর বলো না। ওরা একেবারেই ছেলেমানুষ। রস খাবি খা, তাই বলে প্রাণ দিবি?

মা তাকিয়ে রইলেন ঠাকুরের দিকে। কি বলতে চান ঠাকুর!

ঠাকুর বললেন, আমি দেখলুম খেজুর গাছতলায় একটা কাল কেউটে সাপ আছে। ছেলেরা গেলেই ওদের কামড়ে দিত। তাই

তাড়াতাড়ি অন্য পথ দিয়ে সেই গাছতলায় চলে গেলাম। গিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম সাপটাকে। বলে এলাম, আর কখনো এই বাগানে ঢুকিস নি।

সারদা শুনে অবাক্। ঠাকুর বললেন, দেখো, এই কথাটা যেন এখন বলো না কাউকে।

ঠাকুর সবার প্রাণ বাঁচান। কিন্তু নিজে আর বেঁচে রইলেন না।

পয়লা ভাদ্র সোমবার, বারো শো তিরানব্বুই সাল, ঠাকুর দেহ রাখলেন।

সেদিন কি অঘটন! খিচুড়ি রাঁধছিলেন মা, খিচুড়িতে পোড়া লেগে গেল। ওপর থেকে নিয়ে সেই খিচুড়িই খেল সব ছেলেরা। ছাতে মার একখানা শাড়ি শুকোচ্ছিল সেটা চুরি হয়ে গেল।

একটু পরেই ঘটল মহা অঘটন। মা শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠলেন, আমার কালী-মা কোথায় গেলে গো—

ঠাকুর চলে গেলেন।

শেষ হয়ে গেল মায়ের জীবনের একটি অধ্যায়।

এবার তাঁর আর এক জীবন। সংসারের বাইরে মহাসাধিকার জীবন।

॥ ১৩ ॥

মায়ের জীবনের পট পরিবর্তন হয়েছে। এবার তাঁকে বসনভূষণ পালটাতে হবে। মুছতে হল সিঁথির সিঁদুর, পরতে হল শুভ্র বেশ। হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন, হঠাৎ ঠাকুর এসে খপ্ করে তাঁর হাত চেপে ধরলেন। বললেন, ওকি করছ? আমি কি কোথাও গেছি? এঘর থেকে ওঘর।

এঘর থেকে ওঘর। ইহকাল থেকে পরকাল। ব্যবধান আর কতটুকু! মানুষ বুঝতে পারে না। যারা বুঝতে পারে তারা ইহকালেই পরকালের কাজ করে যায়। তাই তারা পরকালে গিয়েও বেঁচে থাকে ইহকালে।

মার মন উচাটন। ভক্তদের মনও বিষাদগ্রস্ত। তাই সবাই স্থির করলেন তীর্থভ্রমণে যাবেন।

মা বলরামবাবুর বাড়িতে এলেন। যোগানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, গোলাপ-মা সবাই তীর্থযাত্রায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। মাস্টারমশাই আর তাঁর স্ত্রীও যাবেন সেই দলে।

কোথায় যাওয়া যায়? নানারকম জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল। মা বললেন, চলো বৃন্দাবন।

শুভদিন দেখে সবাই একসঙ্গে বৃন্দাবনের দিকে রওনা হলেন। মায়ের সঙ্গে লক্ষ্মীও গেল।

বৃন্দাবনের পথে প্রথমে গেলেন দেওঘর। দেওঘরে দর্শনাদি সেরে গেলেন কাশী। কাশীতে বিশ্বনাথের আরতি দেখে মায়ের ভাব হল। ভুমভুম শব্দে জোরে পা ফেলে বাসায় ফিরে এলেন। সবাই তাঁর কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক্। জিজ্ঞেস করল—মা, তুমি অমন করে হেঁটে এলে কেন?

মা বললেন, ঠাকুরই যে আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।

তিন দিনেই কাশীর দর্শনাদি শেষ হল। কাশী থেকে মা সবাইকে নিয়ে গেলেন অযোধ্যা। শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি দেখে মায়ের মনে কি উল্লাস।

এরপর সবাই চললেন বৃন্দাবনের দিকে।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে ঠাকুর তাঁর হাতের সোনার ইষ্টকবচ দিয়ে গেছেন মাকে। মা সেই কবচ হাতে ধারণ করেছেন। যথারীতি তার পূজা করেন। অতি পবিত্র সেই কবচ। মা রেলের কামরায় শুয়েছেন, কবচসুদ্ধ তাঁর হাত রয়েছে জানালার ওপর। হঠাৎ ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, ওগো, অমন করে হাত রেখেছ কেন বাইরে? ইষ্টকবচ চুরি যাবে যে।

মা তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলেন। কবচ খুলে ফেললেন হাত থেকে। একটি টিনের বাক্স ছিল, সেই বাক্সে কবচটি রেখে দিলেন। ঐ বাক্সেই আছে তাঁর নিত্যপূজার ঠাকুরের ছবি। ঠাকুরের কাছেই ঠাকুরের জিনিস রেখে নিশ্চিন্ত হলেন মা।

যথাসময়ে মা সবার সঙ্গে বৃন্দাবনে এসে পৌঁছলেন।

মধুর তীর্থ বৃন্দাবন। মায়ের কি খেয়াল হল, হাতের বালা খুলতে গেলেন। হঠাৎ দেখা দিলেন ঠাকুর। বললেন, তুমি হাতের বালা ফেলো না। আজ বিকেলে গৌরমণি আসবে, তার কাছ থেকে বৈষ্ণবতন্ত্র জেনে নেবে।

কোথায় গৌরমণি? তিনি এখন গৌরী-মা হয়ে বৃন্দাবনের কোথায় সাধনা করছেন কে জানে?

কিন্তু সেজন্য কিছু ভাবতে হল না সারদামণিকে। ঠাকুর গৌরী-মাকে দেখা দিয়ে বললেন, তোমার মা এসেছে বৃন্দাবনে। তাকে বৈষ্ণবতত্ত্ব শিখিয়ে এসো।

বিকেলবেলা সত্যি গৌরী-মা এসে হাজির হলেন। তিনি সারদামণিকে বুঝিয়ে দিলেন সব কিছু অতি সহজভাবে। বললেন, কৃষ্ণ পতি যার সে চিরসধবা।

যোগেন-মা তখন বৃন্দাবনে। দুজনের দেখা হতেই শোকে উথলে উঠল। যোগেন-মার গলা ধরে মা সারদার কি কান্না। সময় নেই, অসময় নেই, মা শুধু কাঁদেন। কান্নার আর বিরাম নেই।

ঠাকুর একদিন দেখা দিলেন যোগেন-মাকে। বললেন, হ্যাঁ গা, তোমরা এত কাঁদছ কেন? আমি কি কোথাও গেছি? তোমাদের কাছেই তো রয়েছি। এই যেমন এঘর আর ওঘর।

যোগেন-মা সব কথা বলল সারদাকে। সে কথা শুনে মার কান্না কমল।

ছোট্ট বালিকার মত হয়ে গেছেন মা। মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ান আর বিগ্রহের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। দুটো ছেলে দোল-পূর্ণিমার দিন মাকে আবীর দিতে চাইল। মা বললেন, দাও না। তারা মায়ের পায়ে আবীর দিতে না দিতেই মা চটুলা বালিকার মত তাদের আবীর থেকে আবীর নিয়ে তাদের গায়ে ছড়িয়ে দিলেন।

শ্রীমতী রাধার প্রেমের অশ্রুধারায় বিরহের বৃন্দাবন মিলনের বৃন্দাবনে নিত্য রাসক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। মাও যেন শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্ট হয়ে গেলেন।

কোন কোন সময় একাই যমুনায় চলে যেতেন। সঙ্গিরা খুঁজে খুঁজে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতো।

বৃন্দাবনে এসে সময় সময় মার মনে পড়ত ঠাকুরের কণ্ঠে শোনা সেই গানটি—

'যদি কিশোরী তোমার কালাচাঁদের—
গোকুল চাঁদের উদয় ঘটল হৃদে,
দুঃখ কে নাশিবে আর,
কৃষ্ণ বই আঁধার,
কৃষ্ণপক্ষে এখন থাকবি রাধে।
যাই আমাদের যথা আছেন মধুসূদন।
শুনব না তোর বারণ, মারব না তোর রোদন
প্যারী গো আমরা থাকব না তোর সদন
কৃষ্ণত্যাগীর বদন দেখতে নিষেধ আছে পুরাণ বেদে।

যুগ যুগান্তর অতীত হয়েছে। জীবন-দেবতার জন্য শ্রীমতী রাধার অবিরল অশ্রু বিসর্জনে ব্রজভূমি সিক্ত হয়ে আছে। তাঁর প্রতিটি অশ্রুকণা প্রেমের জ্যোতিতে হয়ে আছে উজ্জ্বল। তার কত কাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহে শ্রীমতী সারদা সেই তীর্থভূমিতেই আকুল হয়ে ছুটে এসেছেন।

তাই বুঝি বৃন্দাবনে এসে মায়ের এত কান্না উথলে উঠেছিল!

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এ যে রাধিকার যুগে যুগে অশ্রুবিসর্জন!

পায়ে বাতের ব্যথা, মায়ের চলতে হয়তো একটু কষ্ট হয়। তবু সারা বৃন্দাবন পরিক্রমা করলেন। পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। চলতে চলতে হঠাৎ কোথাও এক জায়গায় থেমে পড়েন। যেন তাঁর কোনকালের চেনা জায়গা।

বংশীবটে একদিন গভীর সমাধি হল মার। সমাধি আর ভাঙে না। যোগেন-মা কানে কানে নাম উচ্চারণ করল, কিন্তু কোন ফল হল না। ছুটে এলেন যোগানন্দ। তাঁর ধ্বনিতে মার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল।

বৃন্দাবনে আবার দেখা দিলেন ঠাকুর। বললেন, যোগীনকে মন্ত্র দাও।

আমি মন্ত্র দেবো? থমকে গিয়ে মা ভাবলেন, ভুল শুনলাম না তো? পরের দিনও ঠাকুর দেখা দিলেন। সে দিনও মা মনে করলেন চোখের ও মনের ভ্রম। কিন্তু তার পরদিন আরও স্পষ্টভাবে দেখা দিলেন ঠাকুর। বললেন, যোগীনকে যে আমি মন্ত্র দিতে পারিনি। আমার বাকী কাজ তোমাকেই করতে হবে।

মা তখন ডাকলেন যোগানন্দকে। কাছে ডেকে তাঁকে ইষ্টমন্ত্র দিলেন।

একদিন চিঠি এল, ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের কাছ থেকে মা যে সাতটি টাকা মাসোহারা পেতেন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মথুর বিশ্বাসের ছেলে ত্রৈলোক্য। ঠাকুর যতদিন বেঁচেছিলেন ঐ টাকাটা মাসে মাসে মাকে দেওয়া হত। ঠাকুরের মৃত্যুর পর দীনু খাজাঞ্চি তা বন্ধ করে দিল।

তা শুনে মায়ের ভক্তরা ক্ষেপেই আগুন! মা বললেন, বন্ধ করেছে করুক। এখন ঠাকুরই চলে গেলেন। ঐ টাকা দিয়ে আমি কি করব?

প্রায় এক বছর ছিলেন বৃন্দাবনে। সেখান থেকে গেলেন হরিদ্বার। ব্রহ্মকুণ্ডের জলে ঠাকুরের নখ আর চুল ফেললেন। তারপর জয়পুর হয়ে গেলেন পুষ্কর। ফিরবার পথে গেলেন প্রয়াগ। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে ফেললেন ঠাকুরের বাকী নখ আর চুল।

এমনি করে তীর্থযাত্রার পর্ব শেষ করলেন শ্রীমা।

বললেন, এবার ফিরে চলো।

॥ ১৪ ॥

বৃন্দাবন থেকে এসে মা আর দক্ষিণেশ্বর গেলেন না। ঠাকুর চলে গেছেন—তাঁরও দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। গিয়ে উঠলেন বলরাম বসুর বাড়িতে। ঠাকুরের পরম ভক্ত বলরাম। তাঁর বাড়ি এখন মহাতীর্থ।

কিছুদিন সেই বাড়িতে রইলেন। মনে পড়ল ঠাকুরের কথা। ঠাকুর তাঁকে বলে গেছেন, আমি যখন থাকবো না তখন তুমি চলে যাবে কামারপুকুরে। সেখানে গিয়ে শাক-সবজি ফলাবে আর শাক-ভাত খাবে।

মা বললেন, কামারপুকুর যাবো।

কিন্তু মাকে একলা যেতে দিতে কেউ রাজী নয়। তাই তাঁর সঙ্গী হলেন গোলাপ-মা আর যোগানন্দ।

বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনের টিকিট করলেন। কারণ সঙ্গে পয়সা বেশী নেই। বর্ধমানে নেমে চললেন পায়ে হেঁটে। ষোল মাইল পথ। পয়সার অভাবে সবাই হাঁটতে লাগলেন।

আগে মা হাঁটতে পারতেন অনেক। এখন আর অত পারেন না। চলতে চলতে পথের পাশে বসে পড়লেন। একে পথ চলার ক্লান্তি তার উপর খিদের কষ্ট।

পথের পাশেই এক গাছতলায় বসে গোলাপ-মা খিচুড়ি রাঁধলেন! তা খেয়ে মায়ের কি আনন্দ। বললেন, গোলাপ, এ তো খিচুড়ি নয়, এ অমৃত।

কামারপুকুর। ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর। দূর থেকে কামারপুকুর দেখা যেতেই মা হাতজোড় করে প্রণাম করলেন।

আমাদের মা সারদামণি—

শ্রীশ্রীমা সারদামণি

শূন্য কামারপুকুর। ঠাকুর নেই, শাশুড়ী চন্দ্রমণিও নেই। মনে হয় যেন শূন্য মরুভূমি।

যোগানন্দ তিন দিন পরেই আবার তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। এবার শুধু তীর্থ-ভ্রমণই উদ্দেশ্য নয়, এবারের প্রধান উদ্দেশ্য তপস্যা। গোলাপ-মাও চলে গেলেন ক'দিন পর।

মা সারদা এখন একা।

গাঁয়ের লোকদের মধ্যে কানাকানি শুরু হল। অনেকেই বলাবলি করতে লাগল, একি গো! বিধবা পরেছে পাড়ওলা শাড়ি, হাতে পরেছে বালা!

মায়ের কানে গেল সে কথা। তিনি তখন হাতের বালা খুলতে গেলেন। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলেন ঠাকুর। বাধা দিলেন বালা খুলতে।

মা ভাবলেন, ঠাকুরের যা ইচ্ছা নয় তার ওপর হাত দেওয়া চলে না। কাজেই নিরস্ত হলেন।

তাঁকে ভরসা দিলেন প্রসন্নময়ী। লাহাদের বোন, ঠাকুরের বাল্যকালের সহচরী। বললেন, গাঁয়ের লোকেরাই অমন। গদাইয়ের বউ তুমি, তারা তোমাকে বুঝতে পারে না। ভয় কি, আমিই তো আছি।

লোকনিন্দা সহ্য করেও মা থাকতে লাগলেন কামারপুকুরে। বাড়ির সামনের ও আশপাশের জায়গাগুলি মা নিজের হাতে কোদাল দিয়ে কোপালেন। সেখানে করলেন শাক-সবজির বাগান।

নিজেই ধান কুটে চাল করেন। শাক ভাত যা জোটে তাই রেঁধে ঠাকুরকে নিবেদন করেন। তারপর নিজে গ্রহণ করেন সেই প্রসাদ।

রাজধানী আজ ভিখারিনী। অতি দরিদ্রের মত তাঁর বেশভূষা—গরিবের চেয়েও সাধারণ তাঁর আহার। তেল-মসলা দূরের কথা কোন-রকমে নুন-ভাত জোটানোই তাঁর দায়। অথচ মুখে তিনি তাঁর এই কষ্টের কথা প্রকাশ করেন না। কেউ জানতে পায় না তাঁর দুঃখের কাহিনী।

শ্যামাসুন্দরী জানেন তাঁর মেয়ে কামারপুকুরে আছে। তাই মেয়েকে দেখবার খুব সাধ হয়। একদিন খবর পাঠালেন, আমাকে একটিবার তুই দেখা দিয়ে যা।

সারদামণি খবর পেয়ে চলে গেলেন জয়রামবাটিতে। মেয়েকে দেখে শ্যামাসুন্দরী আঁতকে উঠলেন। একি! চেহারার কি ছিরি হয়েছে তোর!

পরনে ছেঁড়া ময়লা শাড়ি, মাথায় রুক্ষ চুল। শরীর একেবারে রোগা হয়ে গেছে সারদামণির।

শ্যামাসুন্দরীর চোখে জল এল। সারদামণির মনে কিন্তু কোন দুঃখ নেই। যখন যে ভাবে থাকেন সেভাবেই তিনি সন্তুষ্ট। ঠাকুর বলতেন, আমাকে যে স্মরণ করে তার কখনো খাওয়ার কষ্ট হয় না। সেই বাণী তাঁর কাছে বেদবাক্য।

তাই কিছুদিন জয়রামবাটিতে থাকার পর সারদামণি আবার কামারপুকুরে ফিরে গেলেন। আবার শুরু হল তাঁর দুঃখময় জীবন-যাত্রা।

মা কামারপুকুরে এত কষ্ট সহ্য করছেন সে খবর কলকাতার ভক্তরা জানতে পারল। তারা মার সাহায্যের জন্য চাঁদা উঠাতে লাগল। তারপর খবর পাঠাল মার কাছে—মা, কেন তুমি দূরে আছো, আমাদের কাছে চলে এসো।

কামারপুকুরে যখন এ খবর গিয়ে পৌঁছাল তখন সেখানেও আবার নানারকম গুঞ্জন উঠল। গাঁয়ের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল—এই আধাবয়সী বিধবা, সে কেমন করে সেই সব যুবকদের সঙ্গে গিয়ে থাকবে।

লাহাদের মেয়ে প্রসন্নময়ী জবাব দিল সেই প্রশ্নের। সে বলল, ভক্তরা ডেকেছে, যাবে না? তোমরা কেউ গদাইকে চিনতে পারোনি, তার বউকেও চেনো না।

সারদামণি কলকাতায় চলে এলেন।

এখন সমস্যা হল তিনি থাকবেন কোথায়? ভক্তরা বাগবাজারে

একটি বাড়ি ভাড়া করল। সেই বাড়িতেই তিনি গিয়ে উঠলেন। তবে মাঝে মাঝে বলরাম বোসের বাড়িতে গিয়ে থাকতেন। মাস্টার-মশায়ের বাড়িতেও থাকতেন মাঝে মাঝে।

একদিন বলরাম বোসের বাড়িতে আছেন মা। বিকেলে বেড়াতে ছাদে উঠেছেন। পাশেই নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের বাড়ি। তিনিও তখন ছাদে উঠেছেন, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। গিরিশচন্দ্রের স্ত্রী বললেন, ঐ দেখ মা ছাদে বেড়াচ্ছেন।

গিরিশচন্দ্র তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। চোখ বুজে বললেন, আমার পাপ চোখ। এই চোখ দিয়ে মাকে অমন করে দেখব না।

ঠাকুর বেঁচে থাকতে গিরিশচন্দ্র একদিন বলেছিলেন, তুমি আমার পুত্র হয়ে জন্মাবে। ঠাকুর হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কথা। বলেছিলেন, বয়ে গেছে আমার তোর ছেলে হয়ে জন্মাতে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! ঠাকুর দেহরক্ষা করার পর গিরিশচন্দ্রের একটি ছেলে হল। চার বছর বয়স হল অথচ কথা বলে না। হাবভাবে সব প্রকাশ করে। গিরিশচন্দ্রের কেমন যেন ধারণা হল এই ছেলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ। তাই ছেলের খুব যত্ন করতে লাগলেন। গৃহদেবতার যেমন আলাদা সব কিছু থাকে তিনি সেই ছেলের জন্য আলাদা কাপড়-জামা থালা বাসন সব কিছু ব্যবস্থা করে দিলেন। দেব-জ্ঞানে পালন করতে লাগলেন তাঁর সন্তানকে।

একদিন সেই ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন মার বাড়িতে। মা তখন উপরে। ছেলেটি সবার হাত ধরে টানতে লাগল আর উপরের দিকে দেখিয়ে দিতে লাগল। প্রথমে কেউ কিছু বোঝেনি, পরে অনেকে বুঝতে পেরে বলল, ছেলেটি মাকে দেখতে চায়। তখন তাকে উপরে নিয়ে যাওয়া হল।

উপরে গিয়ে ছেলেটি করল এক অদ্ভুত কাণ্ড। কেউ কিছু বলে দেয়নি, অথচ সে মায়ের পায়ের কাছে গিয়ে ঝুপ করে এক প্রণাম করে বসল।

সেই ছেলেটি কিন্তু বেশীদিন বাঁচল না। চার বছর বয়স না পুরতেই অকালে মারা গেল। গিরিশচন্দ্র ভয়ানক শোক পেলেন। শোকে মুষড়ে পড়লেন তিনি। বললেন, আমি পাপী, ঠাকুরের কাছে কত অপরাধ আমি করেছি।

মায়ের কাছে আসে অনেক ভক্ত। তিনি সবাইকে সমান চোখে দেখেন। ধনী গরীব, উঁচু নীচু কোন ভেদ নাই তাঁর কাছে। তিনি সবার মা। মা যেমন সন্তানদের আবদার সহ্য করে, তেমনি তিনিও করেন।

বাগবাজারের পদ্মবিনোদ পাঁড় মাতাল। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে মুল্লুকচাঁদের পার্ট করে। ওদিকে আবার ঠাকুরের ভক্ত। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরও মাঝে মাঝে আসে বলরামবাবুর বাড়িতে।

একদিন মা বলরামবাবুর বাড়িতে আছেন। দোতলায় শুয়ে আছেন। নীচতলায় শুয়ে আছেন শরৎ মহারাজ, আশুতোষ মিত্র এবং আরও কয়েকজন।

ত্বপুর রাতে এসে পদ্মবিনোদ হাজির হল। ডাকতে লাগল, দোস্ত, দোস্ত!

শরৎ মহারাজকে সে দোস্ত বলে ডাকে। ত্বু চারবার ডাকাডাকি করতেই শরৎ মহারাজের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে গেল আরো কয়েকজনের।

শরৎ মহারাজ বললেন, সর্বনাশ! পদ্মবিনোদ এসেছে। কেউ দরজা খুলো না। দরজা খুললেই কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। ওপরে মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে।

সবাই চুপ করে রইল। কেউ সাড়া দিল না। পদ্মবিনোদ বাইরে থেকে ডাকতে লাগল আর দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল।

তবু কেউ দরজা খুলল না।

পদ্মবিনোদ বাইরে থেকে বলতে লাগল, আমি শালা এত রাত্তিরে এলুম, তবু তুমি দোস্ত একটিবার দরজাটি খুললে না। আচ্ছা!

পদ্মবিনোদ সেদিন রাত্রে চলে গেল। এল আবার পরের দিন।

প্রায় সেই সময়ে গভীর রাত্রে। সেদিন আর দোস্তকে ডাকল না। ডাকতে লাগল মাকে। বলতে লাগল, মা গো, তোমার ছেলে এসেছে। একবার ওঠো মা!

তখন মধুর কণ্ঠে গান তুলল :

ওঠ মা করুণাময়ী, খোল গো কুটির দ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার।
সন্তানে রাখি বাহিরে,
আছ সুখে অন্তঃপুরে
আমি ডাকিতেছি মা-মা বলে,
নিদ্রা কি-ভাঙে না তোমার!

নীচের তলায় সবার ঘুম ভেঙে গেল সেই শুনে। সবাই ভাবতে লাগল, সর্বনাশ আজ আর রক্ষা নেই। পদ্মবিনোদ একটা কেলেঙ্কারী না করে আজ ছাড়বে না।

পদ্মবিনোদের গানের বিরাম নেই। সে ওপরের দিকে তাকিয়ে গাইতেই লাগল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল মায়ের ঘরের একটা জানালা খুলে গেছে।

নীচ থেকে আঁতকে উঠলেন শরৎ মহারাজ। বললেন, সর্বনাশ, মাকে জাগিয়ে তুলেছে।

উপরের দিকে তাকিয়ে পদ্মবিনোদ বলতে লাগল, মা উঠেছ! সন্তানের ডাক তোমার কানে গেছে মা? আমার পেন্নাম নাও।

বলে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগল পদ্মবিনোদ। কিছুক্ষণ পর উঠে গান করতে করতে চলে গেল।

পরের দিন ভক্তরা মাকে বলল, মা, তুমি কেন অমন করে জানলা খুললে?

মা বললেন, কি করব? ডাকে যে!

ভক্তরা বলল, ও যে পাঁড় মাতাল!

মা বললেন, তা হোক গে। মা ডাক শুনলে কি আমি চুপ করে থাকতে পারি? আমি যে মাতালেরও মা।

॥ ১৫ ॥

চন্দ্রমণির মৃত্যুর পর ঠাকুর মাকে বলেছিলেন, গয়ায় গদাধরের পাদপদ্মে গিয়ে আমার মায়ের পিণ্ড দিও।

মা সারদামণির সে কথা মনে পড়ল। ভক্তদের বললেন. আমি গয়ায় যাবো।

ভক্তরা যাত্রার আয়োজন করতে লাগল। কিছুদিন পরই কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে মা গয়া যাত্রা করলেন। গয়াতে পিণ্ডিদান করার পর গেলেন বিষ্ণুগয়া ও বোধগয়া। বোধগয়ায় বড় বড় মঠ দেখে মার মনে কি আনন্দ। তাঁর মনে হল বাংলাদেশে এমন মঠ হলে তাঁর নিরাশ্রয় গৃহত্যাগী সন্তানরা সেখানে আশ্রয় পেত।

ভক্তদের কাছে মা সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তারা বুঝতে পারল এমন একটি মঠের সত্যি খুব দরকার।

সেই পরিকল্পনা থেকেই পরবর্তী কালে তৈরী হয়েছিল বেলুড় মঠ।

গয়াধাম থেকে ফিরে এলেন মা। ভক্তরা তাঁকে নিয়ে গেলেন বেলুড়ে এক ভাড়াটে বাড়িতে। গঙ্গার তীরেই সেই বাড়ি।

তা এবার ভজন সাধনায় রত হলেন। স্ত্রী ভক্তরাও যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে।

একদিন ছাদে বসে ধ্যান করবার সময় মার সমাধি হল। সমাধি আর সহজে ভাঙে না। ভক্তরা কানে মন্ত্র দেওয়ার পর মার চেতনা ফিরে এল।

কিছুদিন পর মার কি খেয়াল হল। বললেন, জগন্নাথধামে যাবার আমার ইচ্ছা হয়েছে।

যোগানন্দ বললেন, মন্দ কি। বলরামবাবুর ভাই হরিবল্লভ বসু পুরীতে আছে। সেখানকার মস্ত বড় উকিল। আপনার কোন অসুবিধা হবে না মা।

মা রওনা হলেন। ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ আর যোগেন-মাও চললেন সঙ্গে। তখন পুরীতে যাবার রেললাইন হয়নি। কিছু পথ যেতে হয় স্টীমারে আর কিছু পথ গরুর গাড়িতে। কলকাতা থেকে চাঁদবালি বড় জাহাজে গেলেন, চাঁদবালি থেকে কটক গেলেন ফেরী-জাহাজে। তারপর কটক থেকে গরুর গাড়ি চড়ে সবাই গেলেন শ্রীক্ষেত্র।

হরিবল্লভ থাকাতে পুরীতে মা এবং সঙ্গীদের কোন অসুবিধা হল না। মাকে মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্য পালকির ব্যবস্থা হল। পুরুতদের পাণ্ডা গোবিন্দ সিঙ্গারী সে ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিন্তু পালকির কথা শুনে মা বেঁকে বসলেন। বললেন, না আমি হেঁটে যাব।

গোবিন্দ বললেন, আপনার যে কষ্ট হবে মা।

মা বললেন, কষ্ট আবার কি! হাঁটা আমার খুব অভ্যাস আছে। তীর্থ করতে এসে কষ্ট করতেই হয়। তা ছাড়া প্রভুর মন্দিরে দীনহীন কাঙালের মত যাওয়াই ভাল।

মন্দিরে ঢুকে সবাই জগন্নাথ দর্শন করছেন, মা রইলেন চোখ বুজে। যোগেন-মা অবাক্ হয়ে বললেন, একি! তোমার সামনে জগন্নাথ, তুমি চোখ বুজে আছ কেন?

মা আঁচলের তলা থেকে বের করলেন একটা ঠাকুরের ফটো। সেটা জগন্নাথের দিকে মুখ করে রাখলেন মা। বললেন, উনি আগে দেখুন। ওঁর এখানে আসবার সুযোগ হয়নি। উনি না দেখলে আমার দেখায় তৃপ্তি নেই।

ঠাকুরের ছবিকে মা আগে দর্শন করালেন। পরে নিজে চোখ খুলে করলেন জগন্নাথ দর্শন।

কিন্তু এ দর্শন তো সাধারণ দর্শন নয়।

মা দেখলেন জগন্নাথ পুরুষসিংহ হয়ে বসে রয়েছেন রত্নবেদীতে—আর মা নিজে তাঁর সেবা করছেন। সারা গায়ে রোমাঞ্চ হল মার। একি সত্যই দেখছেন, না প্রহেলিকা!

জগন্নাথদেবকে মা একদিন শিবমূর্তিতেও দেখতে পেলেন। কি বিচিত্র দর্শন!

পুরীধাম থেকে এসে মা গেলেন আঁটপুরে। প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মভূমি আঁটপুর। সেখানে কিছুদিন রইলেন। তারপর গেলেন কামারপুকুরে।

ঠাকুর বলেছিলেন, আর যাই করো, কামারপুকুরের বাড়িটি যেন খাড়া রেখো। ভক্তরা তোমাকে যতই অট্টালিকা দিক, কামারপুকুরের কুড়েঘরটি যেন ভুলো না।

মা কি তা ভুলতে পারেন? কিন্তু যেতে ফুরসত পান কই? আজ এখানে কাল ওখানে, ভক্তদের ডাকাডাকি লেগেই আছে।

তবু এর মধ্যেই মা সময় করে মাঝে মাঝে চলে যান কামারপুকুরে। যখন যেটুকু দরকার, যেখানে যা দরকার সেভাবেই ঘরদোর মেরামত করান।

গাঁয়ের লোকদের খড়্গ উদ্যত হয়েই আছে। তবু সব কিছু সহ্য করে মুখ বুজে থাকেন সারদামণি। তাঁর হয়ে প্রসন্নময়ী গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে লড়াই করেন। প্রসন্নময়ী না থাকলে মায়ের কামারপুকুরে থাকাই মুশকিল হত।

কলকাতায় এসে মা এবার রইলেন বেলুড়ে ঘুসড়ীর বাড়িতে। সেখানে মাঝে মাঝে যান বিবেকানন্দ। মাকে গান শোনান। মা খুব ভালবাসেন বিবেকানন্দের গান। তাই তিনি বায়না ধরেন আর একটির পর একটি গান শোনেন।

বিবেকানন্দও মাকে গান শুনিয়ে বড় আনন্দ পান। তাঁর মধুর কণ্ঠের গান শুনে মা ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েন—সব কিছু যেন ভুলে যান কিছুক্ষণের জন্য।

এর কিছুদিন পরই বিবেকানন্দ বের হলেন বিদেশ পরিভ্রমণে। যাবার আগে মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। মা আশীর্বাদ করলেন, তুমি দিগ্বিজয়ী হও।

বেলুড়ে থাকাকালে মা একদিন এক আশ্চর্য দর্শন পেলেন। ঠাকুর গঙ্গায় নামতে না নামতেই তাঁর দেহ গঙ্গার জলে মিশে গেল! বিবেকানন্দ 'জয় রামকৃষ্ণ', 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন চারদিকে। সেই জল যার গায়ে পড়েছে সে-ই মুক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখার পর মার মন যেন কেমন হয়ে গেল। ঠাকুরের গায়ে পা লাগবে ভয়ে তিনি গঙ্গাস্নান বন্ধ করে দিলেন।

মার একবার ভয়ানক অসুখ হল। রক্ত আমাশয়। ভক্তরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মায়ের কিন্তু ব্যস্ততা নেই। শরীরের রোগকে তিনি রোগই মনে করেন না।

ভক্তরা ওষুধ এনে দিতে চাইল। কিন্তু মা কিছুতেই ওষুধ খাবেন না। ডাক্তারি ওষুধ তিনি পছন্দ করেন না। গাছগাছড়াই তাঁর প্রিয় ওষুধ।

কিছুদিন পরে অবশ্য মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

শরীরের রোগ তো সারল। কিন্তু মনের রোগ যে সারে না। পাগলের মত মা কি যেন এদিক ওদিক খুঁজে বেড়ান। মনে শান্তি পান না একটুকুও।

মা মাঝে মাঝে দেখতে পান একটি কিশোরী মেয়েকে। দশ এগারো বছর বয়স, সন্ন্যাসিনী। পরনে গেরুয়া বসন, মাথায় রুক্ষ চুল এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ফিরে। তারপর কখন যেন চলে যায়।

এক দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীকেও দেখতে পান মা। সেই সন্ন্যাসী মাকে যেন কি বলে। মা খেয়াল করেন না। একদিন শুনতে পেলেন সন্ন্যাসী যেন বলছে, পঞ্চতপা করো।

পঞ্চতপা! পঞ্চতপা কি! মা জানেন না। জিজ্ঞেস করলেন যোগেন-মাকে।

যোগেন-মা নিজেও জানেন না। শেষে নানা জনের কাছে জিজ্ঞেস করে বিধান নিয়ে এলেন যোগানন্দ মহারাজের কাছ থেকে। পঞ্চতপা ব্রত পালনের বিধান।

কঠিন ব্রত অনুষ্ঠান পঞ্চতপা। পঞ্চবহ্নির-তপস্যা। সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

চারদিকে চারটি অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে বসতে হবে। আর মাথার উপর থাকবে জ্বলন্ত সূর্য, পঞ্চম বহ্নি। এমনিভাবে আগুন আর রোদের মধ্যে বসে করতে হবে ধ্যান আর প্রার্থনা। এর নাম পঞ্চতপা।

পঞ্চতপার আয়োজন শুরু হল। মা তখন বেলুড়ে। যোগেন-মা বললেন, আমিও করবো।

মা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—সে কি, তুমি করবে কেন?

যোগেন-মা বলল—হ্যাঁ, এমন সুযোগ আর কবে পাবো?

—বড কষ্ট হবে যে।

—হোক কষ্ট।

তখন দুজনে মিলেই এই ব্রত করবেন ঠিক হল।

পাঁচ হাত অন্তর অন্তর চারিদিকে চারটি কুণ্ড। কুণ্ডে ঘুঁটের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। আগুন জ্বলল ধকধক করে। মাথার উপরে সূর্য প্রখর তেজ ঢেলে দিতে লাগল। মা স্নান করে ঢুকে পড়লেন তার মাঝখানে।

একদিন নয়, পর পর পাঁচদিন মা ঐ ব্রত পালন করলেন। সকালে ঠাকুরের নাম করে ঢুকতেন আর বের হতেন সেই সন্ধ্যাবেলা।

কি কঠিন পঞ্চতপা ব্রত! গায়ের রং কালো হয়ে গেল। মুখের চেহারা গেল বদলে। কিন্তু ব্রত শেষ হবার পর মনের জ্বালা গেল দূর হয়ে।

সেই দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীকে এর পর আর দেখা গেল না। ব্রত শেষ হওয়ার পর সেই কিশোরী বালিকাটিকেও মা আর কোনদিন দেখতে পাননি।

॥ ১৬ ॥

ছোট ভাই অভয়চরণ কলকাতায় গিয়ে কলেরায় মারা গেল। মা সব সময় তার শয্যাপাশে শিয়রে ছিলেন। আদর-যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি করেননি। স্নেহময়ী-জননীর মত ছোট ভাইটির মাথা যখন নিজের কোলে তুলে নেন তখন অভয়চরণের বেশ জ্ঞান ছিল। সে কাতর চোখে দিদির দিকে তাকিয়ে বলে গেল, দিদি তুমি আমার সংসার দেখো।

সারদামণি মায়ায় আবদ্ধ হলেন।

অভয়চরণ যখন মারা যায় তখন তাঁর স্ত্রী সুরবালা অন্তঃসত্ত্বা। সুরবালা শৈশবেই মাতৃহারা হয়েছিল। দিদিমা ও মাসীমার কাছে সে মানুষ হয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর অল্পদিন পরে সেই দিদিমা আর মাসীমাও মারা গেল। পর পর তিনটি শোকের আঘাত পেয়ে সুরবালার মাথা গেল খারাপ হয়ে। সারদামণি সেই খবর পেয়ে তাকে নিজের কাছে এনে রাখলেন। সারদামণির যত্ন ও আদর পেয়ে সুরবালাও শান্তি পেল।

কিছুদিন পরে সুরবালার একটি মেয়ে হল।

মা সারদার মনে পড়ে গেল ঠাকুরের কথা। ঠাকুর সুরবালার গর্ভাবস্থায় বলেছিলেন, ওর মেয়ে হবে। মাকে বলেছিলেন, সেই মেয়ে হবে তোমার অবলম্বন।

তাই সুরবালার মেয়ে হবার পর সেই মেয়েটিকে মা নিজেই মানুষ করতে লাগলেন। কিছুদিন মেয়েটি তাঁর কাছে ছিল না। একদিন সন্ধ্যায় জপ করতে বসে মা মানস চোখে দেখলেন— জয়রামবাটিতে মেয়েটি খুব কষ্ট পাচ্ছে। হামা দিতে দিতে মেয়েটি ছুটছে তার পাগল মায়ের দিকে। পাগল মা সেদিকে খেয়াল করছে না। কেঁদে আকুল হচ্ছে মেয়েটি।

সেদিন মায়ের ভাল ভাবে জপ করা হল না। আসন ছেড়ে উঠলেন। পরদিনই চলে গেলেন জয়রামবাটি।

সেই মেয়ের নাম রাধু। রাধু সারদামণির যত্নেই বড় হয়ে উঠল। সারদামণি যেমন ভালবাসেন রাধুকে, রাধুও তেমনি সারদা ছাড়া কিছু জানে না।

রাধুকে এত আদর-যত্ন করতে দেখে অনেকেই ভাবত মার সংসারের প্রতি আসক্তি জেগেছে।

এক ভক্ত একদিন বলল মাকে, মা, অনেকেই রাধুকে নিয়ে কানাঘুষা করে। রাধুকে তুমি বড় বেশী ভালবাস। এ নিয়ে হিংসারও অন্ত নেই।

মা বললেন, ওরা কিছু বুঝতে পারে না। বিদ্যুৎ চমকালে আরশিতেই চমকায়—খড়খড়িতে কিছু হয় না।

যাঁদের ঈশ্বরচিন্তায় মন শুদ্ধ তাঁরা যখন যে জিনিস করেন তাতেই ষোল আনা মন দেন। প্রকৃতপক্ষে মা ছিলেন অনাসক্ত। রাধু ও তার মাকে নিয়ে সারদামণির মন সংসারের দিকে নিম্নভূমিতে ছিল বটে, কিন্তু এদের সংস্পর্শেই আবার আগুনে পরীক্ষিত সোনার মত তাঁর দেবী চরিত্র প্রকাশ পেয়েছিল।

দুর্গাপূজার সময় মা জয়রামবাটিতে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভক্তদের ইচ্ছা, এ সময়টা মা বেলুড়ে এসে থাকুন। তারা খবর পাঠাল মাকে। মা ভক্তদের অনুরোধে বেলুড়ে ফিরে এলেন।

মার যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য ভক্তরা রাঁধুনি রেখে দিল। সে-ই রাঁধে। একদিন রাত্রে রাঁধুনি এল না। বারুইদের মেয়ে সুশীলা বলল, মা, আমি যদি রান্না করি, খাবে?

মা বললেন, তোমরা আমার মেয়ে, তোমাদের রান্না খাবো না তো কার রান্না খাবো?

সুশীলা খুশী মনে রান্না করতে চলে গেল। কিন্তু বাদ সাধল কয়েকজন স্ত্রী-ভক্ত। তারা বলল, তুমি বামুনের মেয়ে হয়ে এদের হাতে

রান্না খাবে? ঠাকুর না হয় সন্ন্যেসী ছিলেন, তুমি তো সন্ন্যেসী হওনি।

সুশীলা মনঃক্ষুণ্ণ হল। মা তাকে বললেন, তুমি মনে কিছু কষ্ট করোনি। এদের জ্বালায় কিছু করবার উপায় নেই। ঠাকুর যদি সুযোগ দেন তবে সবই হবে।

মনে দুঃখ করল না সুশীলা। মা যে তার হাতে খেতে চেয়েছেন তাই যথেষ্ট। তাতেই তার তৃপ্তি।

মা ভালবাসেন সবাইকে, তিনি যে সবারই মা। সবাইকে সন্তানের মতই জ্ঞান করেন।

একদিন বারান্দায় বসে আছেন মা। একটি ভিখিরী মেয়ে এসে প্রণাম করল। তার হাতে একটি পেয়ারা। বলল, মা এটি আজ আমি ভিক্ষায় পেয়েছি। আপনাকে দেবার জন্য এনেছি কিন্তু দিতে সাহস হচ্ছে না। আপনি নেবেন তো মা?

মা বললেন, আহা, নেব না কেন! ভিক্ষার জিনিস বড় পবিত্র। বলে হাত বাড়িয়ে মা পেয়ারাটি নিলেন।

ভিখিরী মেয়ের মন আনন্দে নেচে উঠল। চোখ ভরে উঠল জলে। তার ভিক্ষা আজ সার্থক।

বেলুড়ে কি একটা উৎসব উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই সেদিন কর্মব্যস্ত। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে, শালপাতা কুড়িয়ে জায়গা নিকোতে হবে। ভক্তের দল এগিয়ে গেল। মা বললেন, থাক্, তোমাদের করতে হবে না। লোক আছে।

ভক্তরা মনে করল, অন্য কোন লোক হয়ত সাফ করবে। কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল মা নিজের হাতে সবাইয়ের এঁটো সাফ করছেন। অমনি ভক্তের দল ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল। বলল, তুমি একি করছ মা?

মা বললেন, কেন, এতে কি দোষ হয়েছে?

মেয়ে ভক্তের দল বলল, তুমি বামুনের মেয়ে, এদের গুরু, তুমি এদের এঁটো নিজের হাতে তুলবে কেন? এতে যে তাদের অমঙ্গল হবে।

সারদামণি বলতে গেলেন, আমি যে সবার মা ; ছেলেদের কাজ মা করবে না তো কে করবে ।

কিন্তু মাকে কিছু বলবার আর সুযোগ দিল না। তার আগেই ছেলেরা তাঁর হাত থেকে শালপাতা কেড়ে নিয়ে জায়গা নিকোবার কাজে লেগে গেল।

বরিশালে একটি ভক্ত ছেলের অসুখ করেছে। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। ডাক্তাররা তার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু মরবার আগে ছেলেটির মাকে দেখবার ভয়ানক ইচ্ছা হল। তার ধারণা হল মাকে দেখতে পেলে হয়তো তার রোগ সেরে যেত। কিন্তু মাকে কি ভাবে দেখতে পাবে ? নিজে কি করে যাবে মায়ের কাছে ? বিছানা থেকে উঠবার ক্ষমতা নেই। তাই অনেক মিনতি করে চিঠি লিখল মায়ের কাছে। মা যদি দয়া করে এসে দেখা দেন।

কি করুণ সেই চিঠি, চিঠি পড়ে মার মনে খুব কষ্ট হল। মৃত্যু সময়ে ছেলে দেখতে চেয়েছে তাঁকে। কিন্তু তাঁরও যে যাবার উপায় নেই।

মা তখন তাঁর একটা ফটো পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে চিঠি দিলেন, বাবা, ভয় নেই, তোমার অসুখ সেরে যাবে। আমার যে ফটোটি পাঠালাম তাই দেখো।

সেই চিঠি পেয়ে আর ফটো পেয়েই বরিশালের ছেলেটির কি আনন্দ। ছবির ভিতর দিয়েই সে দেখতে পেল জীবন্ত মাকে। আর কি আশ্চর্য। কিছুদিনের মধ্যেই তার রোগ সেরে গেল। ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠল ছেলেটি।

যখন একটু সময় পান তখনই মা চলে যান কামারপুকুর না হয় জয়রামবাটি।

একবার কামারপুকুর থেকে মা জয়রামবাটিতে যাচ্ছেন। সঙ্গে শিবরাম। জয়রামবাটির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন এমন সময় হঠাৎ পথের মাঝখানে শিবরাম দাঁড়িয়ে পড়ল।

মা তা দেখতে পেয়ে শিবরামকে বললেন, কিরে শিবু, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? আয়।

শিবরাম বলল, একটি কথার যদি জবাব দাও তা হলে আসতে পারি।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, কি কথা?

শিবরাম বলল, জবাব দাও তো তুমি কে?

মা অবাক্ হয়ে জবাব দিলেন, সে কি রে, তুই আমাকে চিনিস না? আমি যে তোর খুড়ী।

জবাব শুনে শিবরাম খুশী হল না। সে বলল, আমি আর তোমার সঙ্গে যাবো না। বাড়ির কাছে তো এসে গেছ, তুমি একাই চলে যাও না।

সারদামণি বললেন, বাঃ, আমি তো ঠিকই বলেছি! আমি তো মানুষ—তোর খুড়ী।

শিবরাম বলল, ঠিক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত আমি এক পাও নড়ব না।

সারদামণি তখন বললেন, লোকে বলে কালী।

শিবরাম এবার খুশী হল। বলল, ঠিক তাই তো?

সারদামণি শিবুকে খুশী রাখবার জন্যই বললেন, হ্যাঁ তাই।

শিবু তখন চলতে লাগল। তার সঙ্গে সারদামণি জয়রামবাটিতে গিয়ে পৌঁছলেন।

জয়রামবাটিতে যাওয়া তখন খুবই দরকার ছিল। মা শ্যামাসুন্দরী বৃদ্ধ হয়েছেন। চার ভাই প্রসন্নকুমার, উমেশ, কালীকুমার আর বরদাপ্রসন্ন আছে বাড়িতে। তাদের মধ্যে খুবই ঝগড়াঝাঁটি চলছে। সারদামণি সবার বড়। কাজেই তিনি যদি এই সব ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে না দেন তাহলে কে দেবে?

কিন্তু হিতে বিপরীত হবার মত অবস্থা হল।

গাঁয়ের লোকেরা ভাবতে লাগল—দিদি এসে জুড়ে বসলেন ভাইদের ঘাড়ে। ভাইরাও কিন্তু এতে খুশী নয়। কারণ পারিবারিক ঝগড়া মেটাতে গিয়ে দিদি এক একবার এক এক ভাইয়ের পক্ষে দাঁড়ান,

তখন অন্য ভাই তাতে মনঃক্ষুণ্ণ হয়। অথচ এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

পারিবারিক ঝগড়া মেটাতে গিয়ে সারদামণিকে কি কম ঝক্কি পোয়াতে হল? এক ভাইকে খুশী করতে গিয়ে আর এক ভাই হয় অখুশী। তবু এসব সহ্য করেন ভবিষ্যতের জন্য। ভবিষ্যতে যদি এতে সংসারে সুখ হয়।

সারদামণিকে কাজও করতে হয় অনেক। মা শ্যামাসুন্দরী কাজ-কর্ম বেশী করতে পারেন না, ভাইদের বউরাও ছোট। সারদামণি ধান সেদ্ধ করেন, রাঁধেন এমন কি ভাইদের ছেলেমেয়েদেরও দেখাশোনা করেন।

তেরো শো বারো সালের মাঘ মাসে শ্যামাসুন্দরী মারা গেলেন।

কি আশ্চর্য মৃত্যু। সকালেও এক চাষী মেয়ের কাছ থেকে কিনে আনলেন শাক-সবজি, আনাজ তরকারি। নাতি নাতনীদের সঙ্গে হাসি তামাশা নাচগান করলেন। ধান ভানার কাজে সাহায্য করতেও গেলেন আবার।

কিন্তু হঠাৎ কি হল। শরীর যেন কেমন করতে লাগল তাঁর। ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়লেন।

সেই শোয়াই শেষ শোওয়া।

শ্যামাসুন্দরী মারা যাওয়ার পর সংসারে আরো বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ভাইদের মধ্যে বেশিরকম ঝগড়া মারামারি হতে লাগল। বউদের মধ্যে লেগেই রইল গালিগালাজ ও ঝগড়া। মা নিরুপায় অবস্থা দেখে কলকাতা থেকে সারদানন্দকে জয়রামবাটিতে আসবার জন্য খবর দিলেন।

খবর পেয়েই ছুটে এলেন সারদানন্দ। মা বললেন, এদের মধ্যে একটা ভাগ-বাটোয়ারা করে দাও। নইলে এরা যে ঝগড়া মারামারি করেই মরে যাবে।

ভাগ-বাটোয়ারা আর কি করবেন? বিষয়-সম্পত্তি কারুর কিছু

শ্রীমা ও নিবেদিতা

নেই। শুধু পৈত্রিক সম্পত্তিটুকুই সম্বল। তাই চার ভায়ের মধ্যে ভাগ করে দিলেন সারদানন্দ। সবাইকে ঝগড়াঝাঁটি না করে শান্তিতে বাস করবার উপদেশ দিলেন।

এখন সমস্যা হল মাকে নিয়ে। তিনি কোথায় থাকবেন? মা নিজেই বললেন, আমার জন্য ভাবনা নেই, আমি কখনো থাকবো এর ঘরে কখনো ওর ঘরে।

প্রসন্নকুমারের ঘরেই ঝামেলা বেশী। প্রথম বউ মারা যাওয়ার পর সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। আগের পক্ষে রয়েছে দুটি ছোট ছোট মেয়ে, নলিনী আর মাকু। দ্বিতীয় পক্ষের বউয়ের বয়স অল্প। সংসারের কাজ সেরে মেয়ে দুটির তদারক করতে পারে না। তাই সারদামণিকে দিনের বেশীর ভাগ সময়ই থাকতে হয় প্রসন্নকুমারের ঘরে।

এ নিয়েও হিংসাহিংসির শেষ নেই। প্রথম প্রথম দিদিকে সবাই বোঝা মনে করত। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই দিদির দিকে সবার টান পড়তে লাগল। কারণ দিদির ভক্তসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, তারা খরচের টাকা পাঠাচ্ছে। দিদিকে এখন সংসারে রাখতে পারলে সবার লাভ।

এ নিয়ে মাঝে মাঝেই বড় বিশ্রী ব্যাপার ঘটতে লাগল।

সারদামণি এসব ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার জন্য ভাইদের বাড়ির সীমানার বাইরে একটি ছোট ঘর তৈরি করে নিলেন। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালা।

কিন্তু সেই ঘরের দিকেই ভাইদের নজর এখন বেশী। কে কখন সে ঘরে আসে তার দিকে খেয়াল রাখে, কে কি দেয় তার দিকে নজর রাখে। সবাই কেবল নিজেদের স্বার্থ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত। অথচ দিদি কিসে সুখে থাকবে সেদিকে কারুর বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই।

ওদের থেকে আড়াল হবার জন্যই মা মাঝে মাঝে কলকাতায় চলে যান। কলকাতায় ভক্তদের ডাকও তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে। তাই চলে যেতে হয়। কিন্তু মন এদিকেও টানে। ভাইরা, ভায়ের বউরা

কি করছে, কেমন আছে সে চিন্তাও তিনি করেন। ওরা চিন্তা না করুক, মার চিন্তা যে সবার জন্য।

সেবার মা যাচ্ছেন জয়রামবাটিতে। সঙ্গে গোলাপ-মা, কুসুম ও আরো কয়েকজন।

আগেই কালীকুমারকে চিঠি লিখে দিয়েছেন যেন দেশড়া গাঁয়ে পালকি পাঠানো হয়। একটি নয়, পরপর দুটি দিয়েছেন যাতে অন্ততঃ একটি চিঠিও কালীকুমার পায়।

কিন্তু মা দেশড়া পৌঁছে দেখলেন পালকি নেই। চারদিকে ধু-ধু করছে মাঠ, ওদিকে সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছে। ভারী মুশকিলে পড়ে গেলেন মা।

মা একাই আসতে চেয়েছিলেন। গোলাপ-মা আর কুসুম এক রকম জোর করেই তাঁর সঙ্গে এসেছে। ভাইয়ের সংসারে কাজ করতে করতে মায়ের শরীর কাহিল হয়ে পড়েছে সে খবর শুনেছে তারা। তাই তারা মার কাজ করে দেবে, তাঁর সেবা করবে। সেইজন্যই এসেছে।

অথচ কি মুশকিলেই পড়লেন সারদা ওদের নিয়ে। বিষ্ণুপুর থেকে গরুর গাড়িতে এসেছেন। এখন দেশড়া থেকে জয়রামবাটি কি ভাবে যাবেন? এক হয় হেঁটে না হয় গরুর গাড়িতে। তবে হাঁটাপথে যাওয়াই সুবিধে। গরুর গাড়ি করে যেতে হলে শিওড় হয়ে লম্বা ঘুর-পথে যেতে হবে। কিন্তু সে পথ খুব খারাপ। তাই পালকির জন্য লিখেছিলেন ভাইকে। কিন্তু পালকি তো পাঠায়নি, এমনকি কোন একটা লোকও পাঠায়নি।

এখন কি করা যায়?

সবাই গরুর গাড়ি ভাড়া করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু মা বললেন, আমি পায়ে হেঁটেই যাবো। শিওড়ের ভাঙা রাস্তায় গরুর গাড়ির ঝাঁকুনি সইতে পারব না।

কিন্তু গোলাপ-মা আর কুসুম। তাদের পক্ষেও কি হাঁটা সম্ভব?

তখন ঠিক হল গোলাপ-মা আর কুসুম গরুর গাড়ি চড়ে যাবে। আর সবাই যাবে হেঁটে। যারা হেঁটে যাবে তারা আগেই জয়রামবাটিতে পৌঁছবে। তখন তারা গিয়ে সেখান থেকে লোক পাঠাবে শিওড়ের পথে। সেই লোক গোলাপ-মা আর কুসুমকে পথ দেখিয়ে জয়রামবাটিতে নিয়ে আসবে।

তাই হল। গরুর গাড়িতে চলল গোলাপ-মা আর কুসুম। মা অন্য সবাইকে নিয়ে হেঁটে চললেন। সঙ্গে আলো নেই। রাতের অন্ধকারও ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে।

চেনা পথঘাট। তবু অনেক কষ্টে সেদিন মা বাড়ি গিয়ে পৌঁছলেন। গিয়ে কালীকুমারকে বকুনি দিলেন খুব। বললেন, কিরে কালী, পালকি পাঠাসনি কেন? একটা চিঠিও কি পাসনি? দিদির কথা বুঝি গ্রাহ্যই হয় না?

কালীকুমার নানা অজুহাত দেখাতে লাগল। চিঠি সে পেয়েছিল, কিন্তু পালকি পাঠাবার ফুরসত পায়নি।

মা বুঝলেন সব। বুঝেই চুপ করে রইলেন। তিনি সবার জন্য ভাবেন অথচ কেউ তাঁর জন্য ভাবে না।

একজন ভক্ত জয়রামবাটিতে অনেকদিন ধরে মায়ের কাছে ছিল। সে হঠাৎ কলকাতা থেকে এক জরুরী চিঠি পেল। তাতে লেখা—সে যেন অবিলম্বে চলে আসে।

অমনি মহালয়ার রাত্রের অন্ধকারের মধ্যেই সে রওনা হল যাবার জন্য। পরদিন যেমন করেই হোক তাকে কাজে যোগ দিতে হবে। তা না হলে শত্রুরা তার ভীষণ ক্ষতি করবে কাজের।

মা তাকে রাত্রিবেলায় রওনা হতে নিষেধ করলেন। বললেন, কাল ভোরবেলায় যেও।

মা বুঝতে পারলেন, সেই জরুরী চিঠিটি নিয়ে গিয়েছে শত্রুপক্ষের লোক। কাজেই রাত্রিবেলায় রওনা হলে পথেই তার অনিষ্ট ঘটতে

পারে। তাই নিষেধ করলেন। ভক্ত মায়ের কথা শুনে যাত্রা স্থগিত রাখল।

মায়ের অনুগ্রহে শত্রুর চক্রান্ত থেকে রক্ষা পেল একটি ভক্তের জীবন।

মা কোয়ালপাড়া আশ্রমে থাকতেন মাঝে মাঝে। সেই আশ্রমে থাকার সময় এক ভক্ত গেল তাঁকে দর্শন করতে। ভক্ত কথায় কথায় বলল, ইংরেজ রাজত্বে আমাদের সুখসুবিধা হয়েছে অনেক, বিজ্ঞানেরও অনেক উন্নতি হয়েছে।

মা তা শুনে বললেন, সব সুবিধে হয়েছে বটে বাবা, কিন্তু আমাদের দেশে অন্নবস্ত্রের অভাবটা বড় হয়েছে। আগে অন্নবস্ত্রের অভাবটা এত ছিল না।

ভক্ত অবাক্ হয়ে গেল মায়ের মুখে অমন তাৎপর্যময় কথা শুনে।

॥ ১৭ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষের একবার কলেরা হল। বাঁচার আশা খুব কম। গিরিশচন্দ্র নিজেও আশা ছেড়ে দিয়েছেন। এমন সময় দেখলেন একটি নারী এসে দাঁড়াল তাঁর শিয়রে। ছোট বেলায় মা মারা গেছেন, তাঁর কথা মনেও নেই। তবে কি এই তাঁর মা? ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছেন।

কিন্তু তা নয় তো। নারী কি যেন একটা তুলে ধরল তাঁর মুখের সামনে। বলল, এই নাও মহাপ্রসাদ। খাও। খেলে তুমি ভালো হয়ে যাবে।

তারপর গিরিশচন্দ্র দেখলেন সেই দেবী প্রতিমা মিলিয়ে গেল। এতক্ষণে যেন চেতনায় ফিরে এলেন গিরিশচন্দ্র।...কিন্তু কোথায় সেই মূর্তি?

ঘরে কেউ নেই। অথচ মুখে তাঁর লেগে আছে মহাপ্রসাদের আস্বাদ। কি আশ্চর্য!

সত্যই এর পর ভাল হয়ে গেলেন গিরিশচন্দ্র। কিন্তু সেই নারীর আর সন্ধান পেলেন না। কে সে নারী! মা কি!

কোথায় গেলে মাকে পাওয়া যায়? সবাই যায় কালীঘাটে—আকুল হয়ে মা মা বলে ডাকে। গিরিশচন্দ্রও যেতে লাগলেন শনি-মঙ্গলবারে গভীর রাত্রে। যেখানে বলিদান হয় সেই হাড়কাঠের পাশে বসে মা-মা বলে ডাকেন, চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যায়।

কিন্তু মনে শান্তি আসে না। জীবনের ওপর যেন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কাছে একদিন মনের কথা খুলে বললেন গিরিশচন্দ্র। সব কথা শুনে নিরঞ্জনানন্দ বললেন, তুমি মার কাছে যাও।

মা।

হ্যাঁ! জীবন্ত মা।

জননী সারদা দেবীর মুখের দিকে কোনদিন তাকিয়ে দেখেননি গিরিশচন্দ্র। নিজের মনের পাপ নিয়ে তাকাতে পারতেন না মার দিকে। চার বছরের ছেলে যখন একদিন তাঁকে টানতে টানতে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিল তখন শুধু তাঁর পা দুখানিই দেখেছিলেন। তারপর ছাদে উঠে যেদিন মাকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল, সেদিন ফিরিয়ে নিয়েছিলেন চোখ।

কিন্তু নিরঞ্জননান্দের কথা শোনার পর গিরিশচন্দ্রের কি যে হল, মাকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে উঠল তাঁর মন। ছুটে গেলেন তিনি জয়রামবাটিতে।

শীতের দিন। নীলাকাশে স্নিগ্ধ আলোক। শান্ত মনোরম জয়রামবাটির পথঘাট। শহর ছেড়ে পল্লীর কোলে এলেন ভক্ত গিরিশচন্দ্র।

মাকে দেখলেন। দেখে চমকে উঠলেন প্রবীণ নাট্যকার। এ যেন নাটকেরই কোন এক দৃশ্য।

এ কি, এ যে সেই মাতৃমূর্তি, যাকে তিনি একদিন দেখেছিলেন রোগশয্যার পাশে।

গিরিশচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না। লুটিয়ে পড়লেন মার পায়ের কাছে।

মাগো! তুমি আমার কেমন মা? গুরুপত্নী না পাতানো মা? আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন গিরিশচন্দ্র।

আমি তোমার সত্যিকার মা। গুরুপত্নীও নই, পাতানো মাও নই। সহজ ভাবেই জবাব দিলেন সারদামণি।

মাটির ওপর থেকে মা টেনে তুললেন গিরিশচন্দ্রকে।

গিরিশচন্দ্র ভাববিহ্বল অথচ স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন আবার মায়ের দিকে।

সত্যিকার মা!

হ্যাঁ, সত্যিকার মা-ই তো! মা যেমন ছেলেকে সামনে বসে খাওয়ায়

তেমনি করে গিরিশচন্দ্রকে খাওয়ালেন সারদামণি। রাত্রিবেলায় শুতে এসে গিরিশচন্দ্র দেখলেন তাঁর বালিশের ঢাকনা, বিছানার চাদর সাদা ধবধব করছে। মায়ের আদরের পরশ সব জায়গায়। সোডা সাবান দিয়ে মা নিজের হাতে কেচেছেন। পাপী সন্তানের জন্য মার কি আদর, কি স্নেহ!

বেলুড়ে আবার ফিরে এসেছেন মা। ভক্তরা দলে দলে তাঁকে দেখতে আসছে।

বড় বিরক্ত করে মাকে। তাই নিয়ম করে দেওয়া হল সব সময় মার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

একদিন সেই অসময়ে এলেন নাগমশাই। সাধু দুর্গাচরণ নাগ। জীর্ণশীর্ণ শরীর। ভাল করে চলতে পারেন না। কাঁপতে কাঁপতে ওঠেন সিঁড়ি দিয়ে। তবু মাকে তাঁর দেখা চাই। মার প্রতি তাঁর অসীম ভক্তি। মা একদিন তাঁকে প্রসাদ দিয়েছিলেন শুকনো শালপাতায়। ভক্তির আতিশয্যে শালপাতা শুদ্ধ খেয়ে ফেললেন দুর্গাচরণ।

সেই দুর্গাচরণকে মা একদিন একটি কাপড় দিয়েছিলেন। দুর্গাচরণের কি আনন্দ! কাপড়টি পাগড়ির মত করে মাথায় জড়ালেন। তারপর নাচতে লাগলেন ধেই ধেই করে। বলতে লাগলেন, বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল।

মাকে যেদিন প্রথম দেখতে এসেছিলেন সেদিন ছিল একাদশী। কোন পুরুষভক্তের সঙ্গেই মা সেদিন দেখা করেন না। তাই তারা সিঁড়িতে মাথা ঠুকে প্রণাম করে। ঝি চেঁচিয়ে নাম বলে দেয় আর মা মনে মনে তাদের আশীর্বাদ করেন।

মার সঙ্গে দেখা হবে না শুনে দুর্গাচরণ মাথা ঠুকতে লাগলেন সিঁড়ির ওপর। মাথা ঠোকার বিরাম নেই। মনে হল এখনই বুঝি কপাল ফেটে রক্ত বেরুবে। পেছন থেকে স্বামিজীরা কত বারণ করছেন, তবু তাঁর হুঁশ নেই।

ঝি চেঁচিয়ে বলল, মাগো, দুর্গাচরণ নাগ লোকটা কে? সে এত জোরে মাথা ঠুকে প্রণাম করছে, এখনই মাথা ফেটে যাবে। একেবারে পাগল, কারুর বারণ শুনছে না।

মার কানে সে কথা যেতেই তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, যোগেনকে বলো এখানে পাঠিয়ে দিক।

যোগানন্দ ধরে নিয়ে এলেন দুর্গাচরণকে। মা দেখলেন, কপাল ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জল ঝরছে অঝোর ধারায়। ঝাপসা চোখে ভাল করে দেখতে পারছেন না। পা এখানে ফেলতে ওখানে ফেলছেন। মুখে শুধু মা মা ধ্বনি। পাগল অথচ শান্ত নম্র।

মা এসে ধরলেন দুর্গাচরণকে। কাছে এনে বসালেন। নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন চোখের জল।

সন্তানকে তো এমনি করেই মা স্নেহ করেন। এমনি করেই চোখের জল মুছিয়ে দেন, ভুলিয়ে দেন সন্তানের দুঃখ বেদনা।

মার তখন খাবার আয়োজন হয়েছিল। এল লুচি, মিষ্টি ও ফল। মা সামান্য কিছু আহার করলেন। তারপর খাইয়ে দিতে লাগলেন দুর্গাচরণকে। কিন্তু খাওয়ার দিকে মন নেই—দুর্গাচরণের মুখে শুধু মা-মা ডাক।

মেয়ে ভক্তরা এগিয়ে এল। বলল, একি ব্যাপার! তোমার খাওয়াই যে মাটি হয়ে যাবে আজ। লোক ডাকি, একে সরিয়ে নিয়ে যাক।

সারদামণি বললেন, না না থাক। একটু স্থির হোক।

দুর্গাচরণের গায়ে-মাথায় মা হাত বুলাতে লাগলেন।

নাগ মহাশয় যা কিছু সঙ্গে এনেছিলেন তা আগেই নিবেদন করে দিয়েছিলেন মাকে। মা তা নিজে খেতে লাগলেন আর খাইয়ে দিতে লাগলেন ভক্ত সন্তানকে।

বৃদ্ধ দুর্গাচরণ। কিন্তু মায়ের কাছে এসে একেবারে যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু।

বীর সাধক বিবেকানন্দ ফিরে এসেছেন দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করে। নিয়ে এসেছেন জয়ের মালা।

মাকে এসে প্রণাম জানালেন বীর সন্তান। আবেগভরে বললেন, মাগো, আজকাল আমার সবই যেন উড়ে যাচ্ছে।

সারদামণি হাসতে হাসতে বললেন, দেখো আমাকে আবার উড়িয়ে দিও না।

সহসা বিবেকানন্দের বুকটা বুঝি কেঁপে উঠল। বললেন, তোমাকে উড়িয়ে দিলে আমরা মা থাকবো কোথায়? যে জ্ঞানে গুরু পাদপদ্মে উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান।

কথা শুনে মায়ের মন ভরে ওঠে। আশীর্বাদ করেন বীর দুরন্ত ছেলেকে।

॥ ১৮ ॥

সারদামণি তখন কামারপুকুরে।

কলকাতা থেকে গিরিশচন্দ্র চিঠি দিলেন মায়ের কাছে। মাকে অনুরোধ জানালেন, পূজার সময় এবার আসতেই হবে তাঁকে। পায়ের ধূলো দিতে হবে তাঁর কুটীরে।

এবার নিজের বাড়িতে দুর্গাপূজা করবেন গিরিশচন্দ্র। পূজা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। একদিন স্বপ্ন দেখলেন, মা দুর্গা চণ্ডীমণ্ডপ আলো করে বসে আছেন। গিরিশচন্দ্র বুঝতে পারলেন মা পূজা চান। তাই পূজার আয়োজন করতে লাগলেন। জননী সারদাদেবীকেও আসবার জন্য চিঠি লিখে দিলেন।

মায়ের শরীর ভাল নয়। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে দেহ একেবারে শীর্ণ। তাই জানালেন, তিনি আসতে পারবেন না। সে কথা শুনে গিরিশচন্দ্রের মন খারাপ হয়ে গেল। মা যদি না আসেন তবে পূজার আনন্দই যে মাটি!

কিন্তু ভক্ত সন্তানের ডাকে মা কি স্থির থাকতে পারেন? তাই শেষ মুহূর্তে মা মনের ভাব পরিবর্তন করলেন। রওনা হলেন কলকাতার দিকে।

গিরিশচন্দ্র তখনও খবর পাননি। কিন্তু খবর পেয়ে গেছে অন্যান্য ভক্তরা। তাই মা যখন বিষ্ণুপুরে পৌঁছলেন সেখানে দেখতে পেলেন মাস্টারমশাই আর ললিতকে।

মা তাঁদের দেখে অবাক্। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখানে কেন বাবা?

মাস্টারমশাই বললেন, আমরা আপনাদের এগিয়ে নিতে এসেছি মা। কলকাতায় এখন দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছে, হঠাৎ গিয়ে কোন বিপদে পড়বেন তাই আমরা এসেছি।

সেখানকার চটিতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে সবাই আবার রওনা হলেন।

হাওড়ায় পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলেন আরো দুচারজন ভক্ত অপেক্ষা করছে। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা হল বাগবাজারে যাওয়ার জন্য।

গঙ্গার ধার দিয়ে গাড়ি চলল কুমোরটুলির দিকে। কুমোরটুলি হয়ে যাবে বলরাম বোসের বাড়ি।

গিরিশচন্দ্র স্থির করেছিলেন মা না এলে তিনি চণ্ডীমণ্ডপে যাবেন.না। কাজেই মা এসেছে খবর পেয়ে তাঁর মনে কি আনন্দ! তিনি যেন দেহে নূতন জীবন ফিরে পেলেন। পরদিন ভোরেই তাঁর দিদি দক্ষিণাকে নিয়ে এসে হাজির হলেন বলরাম বোসের বাড়িতে। প্রণাম করে বললেন, তোমাকে আবার নিমন্ত্রণ করতে এলাম মা।

মা জবাব দিলেন, নিমন্ত্রণ তো আগেই পেয়েছি।

দক্ষিণা বললেন, গিরিশ তো বেঁকে বসেছিল মা। তার কি গোঁ! মা না এলে পূজা করব কাকে? করবই না।

মা হাসলেন।

গিরিশচন্দ্র চলে গেলেন খুশী মন নিয়ে।

বিবেকানন্দ ঠিকই বললেন, মা জীবন্ত দুর্গা। সেই জীবন্ত দুর্গা দেখবার জন্য ভিড় জমে গেল বলরাম বোসের বাড়িতে।

সপ্তমীর দিন মার সামনে কল্পারম্ভ হল। দলে দলে লোক আসতে লাগল। সবাই মার চরণ দর্শন করবে। প্রণাম করবে, পূজো করবে। সারা দেহ বস্ত্রে ঢেকে শুধু পা দুখানি খোলা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন মা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল। লোকের পূজাও শেষ হয় না। তিনিও দাঁড়িয়ে আছেন একভাবে। কষ্ট হচ্ছে খুব, তবু লজ্জায় আনতা হয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন।

এদিকে সন্ধিপূজার লগ্ন এসে গেল। মা ভাবলেন গিরিশচন্দ্রের

বাড়ি যাবেন। বেলপাতা, ফুল আর তুলসীর পাহাড় জমে উঠেছে, তবু ভক্ত সমাগমের বিরাম নেই। মা দাঁড়িয়ে আছেন মাটির প্রতিমার মত।

মার গায়ে জ্বর এসে গেল। একে শরীর রুগ্ন তার উপর এই ক্লান্তি কত আর সহ্য হবে?

গিরিশচন্দ্রের কাছে খবর গেল মার জ্বর হয়েছে, তিনি আসতে পারবেন না। সে কথা শুনে গিরিশচন্দ্র হতাশায় ভেঙে পড়লেন। পাগলের মত ডাকতে লাগলেন মা-মা বলে।

সে ডাক বুঝি সারদার কানে গিয়ে পৌঁছল। মাঝরাতে তিনি উঠে বসলেন বিছানায়। গোলাপ-মাকে ডেকে তুলে বললেন, ওঠো, আমি যাবো।

গোলাপ-মা জেগে ওঠে অবাক্ হয়ে গেল। সে কি! এই জ্বর নিয়ে যাবে কোথায়?

সারদামণি বললেন, গিরিশের বাড়ি। আমার শরীর এখন ভাল আছে।

বলরাম বসুর বাড়ির পশ্চিম দিক দিয়ে সরু গলি। সেই গলি দিয়ে এগুতে লাগলেন মা। চলতে পারছেন না, শরীর টলছে, পা কাঁপছে। তবু চলতে লাগলেন। ভক্ত যে আকুল হয়ে ডাকছে তাঁকে।

গোলাপ-মা ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরল।

এত রাত্রে গিরিশচন্দ্রের বাড়ির খিড়কির দরজা বন্ধ। তাই সদর দরজা দিয়ে ঘুরে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন মা, বললেন, আমি এসেছি।

মণ্ডপ জুড়ে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। মা এসেছে! মা এসেছে! উলু দিয়ে উঠল বাড়ির মেয়েরা।

এত রাতে ঝিমিয়ে পড়া মণ্ডপের আলোগুলো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কে বলবে তখন অনেক রাত। কর্মচঞ্চল আলোক-উজ্জ্বল পূজার বাড়ি।

মা দেবী-প্রতিমার মত স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থা হলেন। এই

ভাব দেখে সকলে আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠল। মুঠো মুঠো ফুল ছিঁড়ে অঞ্জলি দিতে লাগল মায়ের পায়ে।

সে কি এক অপরূপ দৃশ্য!

মা নবমী পূজার দিন পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে রইলেন। গ্রহণ করলেন অসংখ্য মানুষের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি। ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রের মনোবাসনা পূর্ণ হল।

* * *

মা এখন বাস করেন ভাড়াটে বাড়িতে। বলরাম বোসের বাড়িতেও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকেন। নিজস্ব কোন থাকবার জায়গা নেই মার।

এতগুলো ভক্ত, অথচ মায়ের নিজস্ব কোন ঠাঁই নেই, এটা কেমন কথা?

স্বামী সারদানন্দ উদ্যোগী হলেন এই ব্যাপারে। টাকা তুলতে লাগলেন। করতে লাগলেন অক্লান্ত পরিশ্রম। অবশেষে বাগবাজারে কিনলেন এগারো হাজার টাকায় চার বিঘে জমি।

জমি তো কেনা হল। এখন তার ওপর বাড়ি তৈরি করতে হবে। সারদানন্দই সব দেখাশোনা করতে লাগলেন। তাঁরই যত্নে ও চেষ্টায় তৈরী হল মার বাড়ি। বাড়ির নীচতলায় উদ্বোধন পত্রিকার কার্যালয় স্থাপন করা হল।

তেরো শো ষোল সাল। মা ঐ বাড়িতে শুভ পদার্পণ করলেন। বাড়িতে মাকে এনে সারদানন্দের কি আনন্দ! তাঁর কর্মশক্তি ও উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

যোগীন মারা যাওয়ার পর শরৎ মহারাজ মার দেখাশোনার ভার নিলেন। মাকে কি ভক্তি করতেন শরৎ মহারাজ। মা-ও খুব ভালবাসতেন তাঁকে।

শরৎ মহারাজের সম্বন্ধে মা বলেছেন, আমার ভার নেওয়া কি সহজ? শরৎ ছাড়া কেউ ভার নিতে পারে এমন তো দেখিনি। সে আমার

বাসুকি। সহস্র ফণা ধরে কত কাজ করেছে, যেখানে জল পড়েছে সেখানেই ছাতা ধরেছে।

মা যোগ্যতম সেবকের যথোচিত সম্মান দিতেন। দীক্ষালাভের জন্য কেউ এলে মা তাকে পাঠিয়ে দিতেন শরৎ মহারাজের কাছে।

একদিন এক ভক্ত এসে খুব ভক্তিসহকারে প্রণাম করল মাকে। মা বললেন, এত বড় প্রণাম করার মানে কি? তুমি যাঁর কাছে যাঁর কৃপা চাও আমিও তাঁর মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে সব করতে পারেন।

আর একদিন একটি মেয়ে এল মার কাছে। তার মনে অনেক দুঃখ। ভাবল, মায়ের পরশ পেলে তার মনের দুঃখ ঘুচে যাবে।

মা বুঝি তার মনের কথা বুঝতে পারলেন। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, সংসারে কে না দুঃখ পেয়েছে? তাই তো বৃন্দে বলেছিল কৃষ্ণকে, কে তোমাকে দয়াময় বলে? রাম অবতারে সীতাকে কাঁদিয়েছ, কৃষ্ণ অবতারে রাধাকে।...তবু তোমাকে ডাকি কেন? তোমার নামে যম-ভয় থাকে না।

মার কোমল হাতের পরশ পেয়ে আর কথা শুনে মেয়েটির মনের দুঃখ তাপ জুড়িয়ে গেল।

॥ ১৯ ॥

বাগবাজারের নতুন বাড়িতে মা একনাগাড়ে রইলেন ছ'মাস। তারপর জয়রামবাটিতে গেলেন। সেখানে ভক্ত নেই, কিন্তু সংসার রয়েছে। বিচিত্র সংসার। মা না দেখলে সেদিকেও অন্ধকার।

ভাই অভয় মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী সুরবালা পাগল হয়ে গিয়েছে। সেই পাগল অবস্থায় তার মেয়ে হয়েছে একটি। সেই মেয়ের নাম রাধারাণী বা রাধু।

সে মেয়ের জন্য সারদামণির যত দুশ্চিন্তা—যত মায়া। মা পাগল, মেয়ের প্রতি মোটে দৃষ্টি নেই। আদরের পরিবর্তন হয়তো কখনো শাস্তি দিয়েই বসে। তাই সারদামণি চোখে চোখে রাখেন রাধুকে। নিজের পাশে বসিয়ে খাইয়ে দেন, নিজের কাছে এনে শোয়ান। রাধুও পিসীমার কাছ ছাড়া হতে চায় না। পিসীকে মা ডাকে আর সুরবালাকে ডাকে নেড়ী-মা।

আর এক ভাই প্রসন্নকুমারের প্রথম পক্ষের দুটি মেয়ে নলিনী আর মাকু। তাদের মায়াতেও বাধা পড়ে গিয়েছেন সারদামণি।

অথচ এই মায়ার কত জ্বালা! জয়রামবাটিতে এসে কত কষ্ট করতে হয় মাকে। দুঃখ পেতেও হয় অনেক।

পাগলী সুরবালা মাঝে মাঝেই খুব খারাপ ব্যবহার করে মার সঙ্গে। অনেক গালিগালাজও করে। তবু মা সব সহ্য করে যান।

একদিন মা পূজায় বসেছেন। হঠাৎ সুরবালা গাল দিয়ে উঠল, ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুরঝি মরুক,—

পূজা শেষ করে মা এলেন সুরবালার কাছে। বললেন, ছোট বউ, আমাকে বকলেই কি আর আমি মরব? আমি যে মরণকে জয় করে বসে আছি।

সুরবালা হয়তো তখন ভুলে গিয়েছে, একটু আগে কি বলে গালাগাল

দিয়েছে মাকে। গালে হাত দিয়ে তাই বলে, বাঃ আমি তোমাকে কখন বকলাম ?

পাগলী আবার রসিকতাও জানে। মা ঠাকুরের ছবিকে ফুল চন্দন দিয়ে সাজান। চুপি চুপি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পেছনে থেকে সুরবালা ফিকফিক করে হাসে আর বলে, ঢং দেখ, নিজের সোয়ামীকে নিজেই সাজাচ্ছে।

সংসারে বাস করেও মা রয়েছেন বন্ধন-মুক্ত। বন্ধন তাঁকে জড়াতে পারেনি। তাই তো যখনই সময় হয়েছে বেরিয়ে পড়েছেন তীর্থের পথে।

কাশী, বৃন্দাবন তীর্থাদি ঘুরে এসেছেন দু বার। তাই এবার যাত্রা করলেন দক্ষিণ ভারতের দিকে। রামকৃষ্ণানন্দ, আশুতোষ মিত্র এবং আরও কয়েকজন ভক্ত তাঁর সঙ্গী হলেন। যাত্রা করলেন মাদ্রাজ মেইলে।

খুরদা পার হয়েই কিছু দূরে প্রসিদ্ধ চিল্‌কা-হ্রদ চোখে পড়ল। তখন সবে ভোর হয়েছে। ফুরফুরে হাওয়ায় সারি সারি বক পাখনা মেলে উড়ে চলেছে। ঝাঁক বেঁধে খাবারের সন্ধানে বিচরণ করছে হ্রদের পাড়ে। আবার দূরের পাহাড় থেকে অন্য সব পাখি উড়ে এসে সেই দলে ভিড়ছে। নীলকণ্ঠ পাখিরা উড়ছে সুনীল আকাশে। বিচিত্র সেই শোভা দেখে মা বালিকার মত আনন্দে দুলতে লাগলেন। আর সবাইকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, ঐ দেখ, ঐ দেখ, কি সুন্দর! কি সুন্দর!

নীলকণ্ঠ পাখি দেখে করজোড়ে প্রণাম করলেন মা।

বেলা আটটায় গাড়ি এসে থামল গঞ্জাম জেলার বহরমপুর স্টেশনে। সেখানে সবাই নেমে পড়লেন। কৈলার কোম্পানির বাঙ্গালী ম্যানেজার এলেন সবাইকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য। তাঁর বাড়িতেই মা তাঁর সঙ্গীদের সহ অতিথি হলেন।

মা সারদামণি এসেছেন—এসেছেন রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী—এ খবর

গঙ্গামে দেখতে দেখতে কেমন করে ছড়িয়ে পড়ল। খবর পেতেই সেখানকার মাদ্রাজীরা নানারকম ফলমূল নিয়ে মাকে দর্শন করতে আসতে লাগলেন।

সেখানে মা রইলেন একদিন। পরদিন সঙ্গীদের নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। কত লোক এল তাঁদের গাড়িতে উঠিয়ে দেবার

পথে প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান ওয়ালটেয়ার। কি মনোরম পর্বতের দৃশ্য। মধ্যে সুরম্য অট্টালিকা, চারদিকে গাছগাছড়া, ফলফুলের বাগান। আলো হাওয়ায় ঝলমল করছে। পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলো দেখে মার আনন্দের সীমা নেই।

একদিন ও একরাত পরে গাড়ি মাদ্রাজ গিয়ে পৌঁছাল।

সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া করা হল মা এবং তাঁর সঙ্গীদের থাকবার জন্য।

মাদ্রাজী ভক্তরা নিয়মিত তাঁর কাছে আসতে লাগল। তা ছাড়াও বহু দর্শনার্থী প্রতিদিন আসতে লাগল মাকে দর্শন করবার জন্য। নার্শারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও বালিকারা এসে তাঁকে সুললিত সুরে তামিল ভজন গান ও বেহালা বাজিয়ে শুনাত। সন্ধ্যাবেলায় মা সমুদ্রতটে গিয়ে বসতেন। তাতে তাঁর মন থেকে সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়ে যেত।

মাদ্রাজে রয়েছে ইংরেজদের তৈরী এ দেশের প্রথম দুর্গ। দেখবার মত অনেক কিছু নাকি সেখানে আছে। তাই মা একদিন গেলেন সেই দুর্গ দেখতে। তার মধ্যে নানা রঙের সামুদ্রিক মাছ দেখলে সত্যি চোখ জুড়িয়ে যায়। মা ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। আর দেখলেন সেখানকার প্রসিদ্ধ ও প্রধান শৈব ও শাক্তদের মন্দির। সেই মন্দিরের শোভায় ও পরিবেশে মার মন মুগ্ধ হয়ে গেল। সেখানকার দর্শনীয় সব কিছুই মা দেখলেন।

একদিন মার কাছে এসে হাজির হল এক যুবক। বলল, মা আমাকে দীক্ষা দিন।

মা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার কাছে কেন দীক্ষা নেবে বাবা ?

যুবক বলল, ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে আপনার কাছে দীক্ষা নিতে বলেছেন।

মা তাকে দীক্ষা দিলেন।

এমনি আরো কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত হল। কেউ স্বপ্নে দেখেছে ঠাকুরকে, কেউ বা মাকে। মা তাদেরও দীক্ষা দিলেন। দিনে দিনেই সেখানে ভিড় বাড়তে লাগল মাকে দর্শন করবার জন্য। অনেকে মার পদস্পর্শ করতে না পেরে দূর থেকে দর্শন ও প্রণাম করেই ধন্য হল।

মাদ্রাজে বেশ কিছুদিন থেকে মা এলেন মাদুরায়। সেখানে এক মাদ্রাজী ভক্তের অতিথি হলেন। দর্শন করলেন সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন মাদুরার মন্দির। এত বড় মন্দির দাক্ষিণাত্যে আর নেই। মন্দিরে আছে সুন্দরেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আর আছে মীনাক্ষী দেবীর মূর্তি। মন্দিরের পাশেই শিবগঙ্গা নামে সরোবর। ও দেশের নিয়ম মেয়েরা প্রদীপ কিনে নিজ নিজ নামে সন্ধ্যায় শিবগঙ্গার পাড়ে রেখে যায়। মা-ও তাই করলেন। স্নান করে নিজের নাম লিখে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে এলেন সরোবরের তীরে।

বিকেলবেলা মা পাম্বান প্রণালী বা হরবলার খাড়ির তটে গেলেন। তারপর রাত্রিবেলায় গিয়ে পৌঁছলেন রামেশ্বর স্টেশনে।

সেখানে এক পাণ্ডার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হল। খাড়ির তীরবর্তী স্টেশনের নাম মণ্ডপম্। রামেশ্বর পর্যন্ত কোন রেলপথ নেই। কাজেই ছোট স্টীমারে যেতে হল।

রামেশ্বর মন্দির দেখে মা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সম্পূর্ণ পাথরে তৈরী বিরাট মন্দির। অতি চমৎকার মন্দিরের গায়ে ক্ষোদিত মূর্তি ও কারুকার্য। মন্দিরের চারদিকেই রাজপথ। ভিতরে পুবদিকে বারান্দা—সেখানে রাজা-মন্ত্রীদের পাথরের অসংখ্য প্রতিমূর্তি।

কয়েকটি মহলে মন্দিরটি ভাগ করা। দু তিন মহল পরেই রামেশ্বর মহল। ঐ মহলের উঠোনে উঁচু পাথরের তৈরী নন্দীবৃষ। কাছেই তিনতলা সমান উঁচু একটি স্তম্ভ পোঁতা। এই মহলের চারদিকে বিশ্বনাথ কেদারনাথ প্রভৃতি মূর্তি আলাদাভাবে সাজানো। পাশের মহলে পার্বতী দেবীর মূর্তি।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব সেই সব নিদর্শন দেখলে সত্যি চোখ জুড়িয়ে যায়।

রামেশ্বর লিঙ্গ বালুকাময় পাথরে তৈরী—একটি ছোট কুণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। মূর্তিটি সোনার মুকুটে ঢাকা থাকে। রামনাদ রাজার কাছারিতে নির্ধারিত দক্ষিণা জমা দিলে মূর্তি দর্শনের অনুমতি মিলে। বাবার নিত্যস্নান হয় গঙ্গাজলে, ভোগেও লাগে গঙ্গাজল। কথিত আছে, পুণ্যবতী রানী অহল্যাবাঈ ঐ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।

বাবার পূজারা সকলেই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। অন্য কোন জাতীয় যাত্রীর মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এমন কি আর্যধর্মের ব্রাহ্মণদেরও সেই মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই। পূজারীদের হাত দিয়ে পূজো পাঠিয়ে দিতে হয়।

মা সারদামণির কিন্তু মন্দিরে প্রবেশের কোন অসুবিধা হল না।

রামনাদের মহারাজা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। তিনি শ্রীমাকে দেবী-জ্ঞানে মন্দিরে প্রবেশ করবার ব্যবস্থা করে দিলেন। মায়ের সঙ্গীরাও এই সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে গেলেন।

মা মন্দিরে ঢুকে বসলেন কুণ্ডের পাশে। মুকুট সরিয়ে গঙ্গোত্রির জল ঢাললেন রামেশ্বরের মাথায়। পূজা করলেন বেলপাতা ও গঙ্গাজলে। কথকের মুখে শুনলেন রামেশ্বরের অপূর্ব আখ্যান।

সমুদ্রের ওপর সেতু বেঁধেছেন শ্রীরামচন্দ্র। লঙ্কা থেকে সীতাকে উদ্ধার করে সেই পথ দিয়ে ফিরছেন। স্বামীর এই কীর্তি দেখে সীতা আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, এই কীর্তি যাতে চিরস্থায়ী হয় তার ব্যবস্থা করে যেতে হবে। তাই স্থির করলেন এখানে প্রতিষ্ঠিত করবেন শিবমূর্তি।

হনুমানকে সীতা আদেশ দিলেন শিবমূর্তি নিয়ে আসার জন্য। হনুমান নানা দেশ ঘুরে নানা জাতের শিব নিয়ে এল। কিন্তু আসল শিব, কাশীর বিশ্বনাথকেই সে আনে নি।

সীতা তখন বললেন, আসল শিবই যে আন নি। যাও, কাশী থেকে বিশ্বনাথকে নিয়ে এস।

হনুমান তখন আবার কাশীর দিকে রওনা হল। কিন্তু সেই যে গেল আর ফিরবার নাম নেই। সীতা অধীর হয়ে উঠলেন। পূজার জন্য যে পিণ্ড তৈরি করেছিলেন তাই ঢালতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সেই পিণ্ড জমে পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল, আর শিবলিঙ্গের মত আকার হয়ে গেল। সীতা তার নাম রাখলেন রামেশ্বর।

এদিকে তার কিছুক্ষণ পরেই হনুমান ফিরল। তার লেজে বাঁধা বিশ্বনাথ। সে এসে দেখে তার আসবার আগেই শিব প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে।

এতে হনুমানের মনে খুব দুঃখ হল, রাগও হল। সে স্থির করল, ঐ শিবকে তুলে ফেলবে। তাই তার লেজ ঐ পিণ্ডের গায়ে জড়িয়ে প্রাণপণে টানতে লাগল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ঐ শিবকে নাড়াতে পারল না। সে ছিটকে এক মাইল দূরে গিয়ে পড়ল। ভক্তবৎসল রাম তখন এসে হনুমানকে প্রবোধ দিলেন। বললেন, দুঃখ করছ কেন? তোমার আনা শিব ফেলা যাবে না। এই শিবও প্রতিষ্ঠা হবে।

কিন্তু হনুমানের মনের সন্দেহ ঘুচল না। তাই শ্রীরামচন্দ্র তাকে বললেন, তোমার শিবের পূজা আগে হবে, তারপর হবে রামেশ্বরের পূজা।

হনুমানের বয়ে নিয়ে আসা শিবের প্রতিষ্ঠা হল। হনুমান যে স্থানে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল সে স্থানের নাম হল রামঝরকা।

আজও শ্রীরামচন্দ্রের প্রবর্তিত সেই নিয়ম চলে আসছে। হনুমানের বয়ে আনা সেই শিবের পূজা হয় আগে। তারপর হয় রামেশ্বরের পূজা। ভগবান রেখেছেন ভক্তের মান।

মা সারদা অতি ভক্তিভরে সেই কাহিনী শুনলেন।

রামনাদের দেওয়ান একদিন মন্দিরের মণিকোঠা খুলে দিলেন মার সামনে। সামান্য একটি প্রদীপ জ্বলছে, তারই আলোকে ঝলমল করছে মণিকোঠায় সঞ্চিত অসংখ্য হীরে জহরৎ ও অলংকার। দেখে মায়ের চোখ ঝলসে গেল।

দেওয়ান বললেন, যদি কোন অলংকার আপনার পছন্দ হয় নিতে পারেন এখান থেকে।

মা চমকে উঠলেন, কি হবে আমার সোনার ও হীরের অলংকার দিয়ে? আমার হাতে যে হোগলাপাকের বালা আছে, তাই যথেষ্ট। এই অলংকার খুলতে গিয়েও খুলতে পারেন নি তিনি। ঠাকুর এসে হাত চেপে ধরেছেন। এই অলংকারের চেয়ে জগতে আর বড় অলংকার কি আছে?

তাই মা কোন অলংকার নিলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল রাধুর কথা। রাধুর ওপর তাঁর অসীম মমতা। রাধুকে ডেকে এনে বললেন, ছ্যাখ, তোর যদি কিছু দরকার হয় তো নে।

কিন্তু কথাটা বলেই মা চমকে উঠলেন। কি ভয়ংকর কথা তিনি বলে ফেলেছেন! এত হীরে-জহরৎ ঝলমল করছে, যদি দামী কোন জিনিস চেয়ে বসে! অমনি কাতর স্বরে তিনি বলতে লাগলেন, ঠাকুর, ওর মনে যেন কোন আকাঙ্ক্ষা না জাগে!

ঠাকুর বুঝি সে কথা শুনলেন। সুবুদ্ধি দিলেন রাধুর মনে। রাধু সেই ঝলমলে হীরে জহরতের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ওমা! ওসব দিয়ে আমি করব কি! আমার পেনসিলটা হারিয়ে গেছে, একটা পেনসিল কিনে দাও।

মা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। সে দিনই একটা পেনসিল কিনে দিলেন রাধুকে।

রামেশ্বরে মা তিন দিন রইলেন। তারপর মাদুরা ও মাদ্রাজ হয়ে গেলেন বাঙ্গালোর। ওখানে দলে দলে লোক ফুল দিয়ে মায়ের চরণ পূজা করতে লাগল। ফুল জমে জমে স্তূপ হয়ে গেল।

মঠের চন্দন গাছ দেখে মায়ের মনে কি আনন্দ। ছোট পাহাড়

দেখেও মায়ের মনে খুশির সীমা নেই। সন্ধ্যাবেলা পাহাড়ে উঠে একান্ত মনে জপ ধ্যান করলেন মা।

এভাবে দক্ষিণের সব তীর্থ সেরে মা যাত্রা করলেন কলকাতার দিকে।

মা যেদিন কলকাতায় এসে পৌঁছলেন সেদিন কলকাতাবাসীর মনে কি আনন্দ! কতকাল পরে যেন মা সন্তানদের কাছে ফিরে এলেন। গাড়ি স্টেশনে ভিড়তেই নয়টি বোমা ফাটান হল। শত শত ভক্ত মহানন্দে গাইতে লাগল স্তুতিবন্দনা।

* * * *

কামারপুকুর থেকে ছয় ক্রোশ দূরে ডিহিবায়রা গ্রামে আছে প্রসিদ্ধ রণজিৎ রায়ের দীঘি। মহামায়া দুর্গা ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেন রণজিৎ রায়ের ঘরে। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই সেই দীঘিতে লীন হয়ে যান। সেই থেকে ঐ পুকুর পবিত্র এবং ঐ স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে অর্থাৎ বারুণীর দিন ঐ দীঘিতে স্নান করবার জন্য দেশদেশান্তর থেকে বহু লোক আসে। মা বারুণী স্নান উপলক্ষে সেই দীঘিতে এসে স্নান করলেন। ফেরার পথে বিক্রমপুরের বিশালাক্ষী দর্শন করলেন। রণজিৎ রায় কন্যাকে হারাবার পর সংসার ত্যাগ করে এখানে এসে বাকী জীবন কাটিয়েছিলেন।

কামারপুকুর থেকে প্রায় তের ক্রোশ দূরে বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ি। রাজারা খুবই ধার্মিক ছিলেন। তাঁদের স্থাপিত বহু দেবমন্দির আছে সেখানে। সেইসব মন্দিরের কারুকার্য অতি সুন্দর, গর্ব করার মত। ঠাকুর বলতেন, বিষ্ণুপুর গুপ্ত বৃন্দাবন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সারদাকে ঐ সব মন্দির দেখাবেন।

মা সারদা এতদিনে সেই মন্দির দেখে জীবনকে যেন ধন্য করলেন।

ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরামবাবুর জমিদারি আছে উড়িষ্যার কোঠারে। মায়ের

কি খেয়াল হল। কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তুমাস রইলেন।

সরস্বতী পূজার সময় সেখানে উৎকল দেশীয় যাত্রাগান হয়। সেই গান শুনলেন মা। তুটো ছেলে রাধাকৃষ্ণ সেজে এমন সুন্দর নেচেছিল যে মা বহুদিন সে কথা ভুলতে পারেন নি। কথায় কথায় লোকদের সেই কথা বলতেন।

দেবেন মুখার্জী কোঠারের পোস্টমাস্টার। অবস্থাচক্রে পড়ে খ্রীষ্টান হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর মনে শান্তি নেই। ধর্মত্যাগ করে তিনি সুখী হতে পারেন নি, বরং অনুতপ্ত। মাকে দেখে তাঁর কি যে হল। তিনি স্বধর্মে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। একদিন মায়ের কাছে এসে কাতরকণ্ঠে বললেন, মা তুমি আমাকে দীক্ষা দাও।

মা তাঁকে শুদ্ধি করে গায়ত্রী মন্ত্র দিলেন। মাথা মুড়িয়ে এসে দেবেন মুখার্জী প্রণাম করলেন মাকে। মা তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন আর দিলেন প্রসাদী একখানা কাপড়।

অনুতপ্ত পোস্টমাস্টার ফিরে পেলেন মনের শান্তি।

শ্রীমা পতিত উদ্ধারিণী!

॥ ২০ ॥

'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভক্তদের কাছে কথায় কথায় অনেকদিন বলেছিলেন সেই কথা।

মা সারদামণির কানেও সে কথা গিয়েছিল। কিন্তু তিনি 'চৈতন্য-লীলা' দেখবার সুযোগ পান নি। তার কিছুকাল পর বইটির অভিনয়ও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

'চৈতন্যলীলা' দেখবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কিন্তু মার মনে ছিল। সেকথা একদিন জানতে পারলেন গিরিশচন্দ্র। বইটি দেখার মার এত ইচ্ছা অথচ তাঁর সেই ইচ্ছা তিনি পূরণ করতে পারবেন না?

তখন গিরিশচন্দ্র একটি বিশেষ অভিনয় রজনীর আয়োজন করলেন। জগাই সাজবেন অর্ধেন্দুশেখর আর মাধাই সাজবেন গিরিশচন্দ্র নিজে।

কিন্তু মুশকিল বাধল নিমাইয়ের পাঠ নিয়ে। নিমাই সাজতো ভূষণ, কিন্তু সে অভিনয় ছেড়ে দিয়েছে।

গিরিশচন্দ্র তাকে গিয়ে ধরলেন। মা অভিনয় দেখবেন শুনে ভূষণ একরাত্রের জন্য নিমাই সাজতে রাজী হল। এমনকি সেজন্য কোন টাকাও দাবি করল না।

অভিনয় শুরু হল।

গিরিশচন্দ্র বিশেষ ভাবে বক্স-সীটে মায়ের জন্য জায়গা করে দিয়েছেন। অনেক দিন পর 'চৈতন্যলীলা'র বিশেষ অভিনয়—তাই দর্শকও সেদিন হয়েছে প্রচুর।

নিমাইর পাঠ মায়ের খুব ভাল লাগল। বললেন, মেয়েটিকে দেখলুম ভক্তিমতী। ভক্তি না থাকলে কি হয় গা! নিমাই—তা ঠিক নিমাই, কে বলবে মেয়েমানুষ।

জগাই-মাধাইয়ের পাঠ দেখেও মা মুগ্ধ হলেন। বললেন, ওদের মত ভক্ত কে? রাবণের মত ভক্ত কে? হিরণ্যকশিপুর মত ভক্ত

কে? এই দেখ না, গিরিশ ঠাকুরকে কত গাল দিত, কিন্তু সে কি ঠাকুরের কম বড় ভক্ত! এঁরা সব ঐভাবে এসেছেন। ভক্ত হওয়া কি কম কথা!

সঙ্গে ছিল লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে মা বললেন, হ্যাঁরে লক্ষ্মী, ঐ গানটা কিরে? সেই, মুক্তি দিতে কাতর নই—

লক্ষ্মী তখনই গুনগুন করে গাইল, মুক্তি দিতে কাতর নই গো, ভক্তি দিতে কাতর হই।

মা থিয়েটার দেখতে এসেছে শুনে তাঁকে দেখবার জন্য কত ভিড়। থিয়েটার ভাঙলে গিরিশচন্দ্র মাকে ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিলেন।

একদিন থিয়েটারের অভিনেত্রীরা মাকে দেখতে এল। মা সবাইকে আদর করে কাছে বসালেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। খেতে দিলেন প্রসাদ।

তিনকড়ি বিল্বমঙ্গল পালার পাগলীর গান গাইতে লাগল। সেই গান শুনে মা সমাধিস্থা হলেন।

একদিন এলেন এক বর্ষিয়সী ইংরেজ মহিলা। চোখে মুখে তাঁর কাতরতার চিহ্ন, মনে অস্থিরতার ভাব।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কি চাও মা?

মায়ের নিষ্ঠা ও সম্ভ্রম বাঁচিয়ে মহিলা বসলেন একটু দূরে। কিন্তু মায়ের কোন দ্বিধা ও নিষ্ঠার সংকোচ নেই। তিনি অতি সহজভাবে ব্যগ্রতার সঙ্গেই এগিয়ে এসে নানা প্রশ্ন করলেন বিদেশী মহিলাকে।

মহিলার মনের সংকোচও যেন কেটে গেল। তিনি বললেন, বড় বিপদে পড়ে এসেছি মা। আমার মেয়ের জীবন বিপন্ন।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?

বিদেশী মহিলা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, ডাক্তার বলেছে জীবনের আশা নেই। দয়া করুন। আপনার দয়া পেলে সে ভাল হয়ে উঠবে। আপনিই তো যীশুমাতা মেরী। আপনার ওপর আমার অপার শ্রদ্ধা

ও বিশ্বাস। আমার একমাত্র মেয়ে মরণাপন্ন, দয়া করে তাকে আপনি বাঁচান।

বিদেশিনী মহিলার কাতরতায় মা সারদামণির মন ব্যথায় ভরে উঠল। জলে ভরে উঠল তাঁর ছুচোখ। মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি চিন্তা করো না মা। তোমার মেয়ে ভাল হয়ে যাবে। তোমার মেয়ের জন্য আমি প্রার্থনা করবো ঠাকুরের কাছে।

মায়ের কথা শুনে ও তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বিদেশিনী মহিলা নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, আপনি যখন ভরসা দিয়েছেন, তখন মেয়ে আমার নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে।

আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো ইংরেজ মহিলার সারা অন্তর।

কাছে ছিল গোপাল-মা। তাকে সারদা বললেন, ঠাকুরের একটি ফুল এনে দাও তো।

গোপাল-মা বেলপাতার সঙ্গে একটি পদ্মফুল এনে দিল মার হাতে।

মা সেটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন। তারপর বিদেশিনীর হাতে তুলে দিলেন সেই ফুল।

ইংরেজ মহিলা কৃতজ্ঞ চিত্তে মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে গেলেন। মনে নিয়ে গেলেন বিপুল সান্ত্বনা।

মহিলা বিদায় নেওয়ার সময় সারদা বললেন, তোমার মেয়ে কেমন থাকে খবর দিও মা।

কয়েকদিন পরেই মা চিঠি পেলেন সেই ইংরেজ মহিলার। তাঁরা তখন বিদেশের পথে যাত্রা করেছেন। তাঁদের মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠেছে।

সবার মা যে সারদা। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সবার মা। মায়ের কাছে কোন জাত নেই। তাই তো একদিন নীচ জাতির মেয়ের হাতেও খেতে রাজী হয়েছিলেন।

নিবেদিতাও তো বিদেশিনী মেয়ে।

বিবেকানন্দের মানসকন্যা।

কিন্তু তাঁকে দেখে পাড়ার মেয়েরা কত নাক সিটকায়। কত বিদ্রূপ করে। বলে, ম্লেচ্ছ মেয়ে, তাকে নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি কেন?

মা কিন্তু তাদের কথা কানে তোলেন না। কারণ তিনি জানেন সমাজের অবস্থাটাই এমন। মেয়েদের মনে উদারতা নেই, তারা স্বার্থের

যে মেয়েরা নিবেদিতাকে দেখে নাক সিটকিয়েছে, তাদের বিপদেই আবার নিবেদিতা ছুটে গিয়েছেন, রোগে শোকে হয়েছেন তাদের সমব্যথী। তখন ওরাই আবার নিবেদিতার জয়গান করেছে। এই তো মানুষ, এই তো জগৎ।

মা সব জানতেন তাই গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু নিবেদিতা মনে দুঃখ পেতেন মায়ের অসুবিধার কথা ভেবে। তাই দিনে না গিয়ে প্রায়ই রাত্রে মার কাছে যেতেন।

একদিন রাত্রে মার কাছে গিয়েছেন। গিয়ে দেখলেন মার মুখে আলো পড়েছে। অমনি একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিলেন। প্রণাম করলেন মাকে। পায়ে হাতের ছোঁয়া লাগলে পাছে মায়ের নিষ্ঠার কোন ব্যাঘাত হয় সেজন্য রুমাল দিয়ে সন্তর্পণে পায়ের ধুলো তুলে নিলেন।

একদিন রাত্রিবেলায় মায়ের কাছে যাওয়ার পরই আকাশে ঝড় উঠল! ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। বাজের শব্দে কেঁপে উঠতে লাগল বুক।

নিবেদিতা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখ বুজে বলে উঠলেন, কালী, কালী, কালী!

একদিন নিবেদিতাকে বললেন মা, এদেশে গরমে তোমার খুব কষ্ট হয়, তাই না?

নিবেদিতা বললেন, কষ্ট কি মা! মানুষের সেবা করতে পারলেই আমার আনন্দ।

মা নিবেদিতার জন্য তৈরি করলেন একটি ছোট উলের পাখা।

একদিন নিবেদিতা আসতেই বললেন, এই নাও, তোমার জন্য আমি এটা তৈরি করেছি।

নিবেদিতা হাত বাড়িয়ে অতি আগ্রহের সঙ্গে মায়ের কাছ থেকে পাখাটি নিলেন।

নিয়েই তাঁর কি আনন্দ! একবার মাথায় রাখেন, একবার বুকে ঠেকান, একবার মুখের কাছে নিয়ে হাওয়া করেন।

ছোট্ট একটি জিনিস, তা পেয়েই নিবেদিতার কত গর্ব! মা তাঁকে দিয়েছেন। কত লোককে তিনি দেখান। দেখিয়ে বলেন—মা নিজের হাতে তৈরি করেছেন, আমাকে দিয়েছেন।

মাকে সেবাযত্ন করে নিবেদিতা কত খুশী হন। মা'ও বড় ভালবাসেন তাঁকে।

নিবেদিতা এদেশের জন্য কত কিছু করেছেন। মেয়েদের জন্য গড়ে তুলেছেন একটি বিদ্যালয়।

সেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসবের দিন নিবেদিতা সবার আগে খবর দিয়ে মাকে নিয়ে গেলেন। মা না গেলে যে মঙ্গল-উৎসবই সুষ্ঠুভাবে হবে না।

মায়ের আগমনে উৎসব আনন্দমুখরিত হয়ে উঠল।

নিজের দেশ ছেড়ে দরিদ্র ভারতবাসীর সেবায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন নিবেদিতা। বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দই তাঁকে এদেশে টেনে এনেছেন।

বিবেকানন্দের তিরোধানের পর নিবেদিতা আশ্রয় নিলেন মায়ের চরণতলে। আর মা-ও তাঁকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। বললেন, এই তো তোমার দেশ।

নিবেদিতা বললেন একদিন, মা গো, হয় তো পূর্বজন্মে আমি ছিলাম তোমার মেয়ে। ঠাকুরের বাণী প্রচারের জন্য আমরা এদেশে জন্মেছি।

কল্যাণময়ী নিবেদিতা মায়ের কাছে যেন ঠিক তাঁর মেয়ের মত। অতি সহজ অতি সরল তাঁর ব্যবহার।

একদিন অভিমানভরেই নিবেদিতা বললেন, মা ভারতের সব কিছু শিখলাম। কিন্তু তোমাদের মত পা মুড়ে বসাটা কিছুতেই শিখতে পারছি না।

সারদামণি হাসলেন সেই কথা শুনে।

একদিন নিবেদিতা সন্ধ্যাবেলা এলেন তাঁর সহকর্মিণী ক্রিস্টিনকে নিয়ে। মাকে দেখিয়ে বললেন, এই যে আমাদের মা—সারদা-মা—আমাদের কালী।

মা হেসে হেসে বললেন, না বাপু, আমি কালী হতে পারবো না। অমন করে জিব বার করে থাকতে পারবো না।

মায়ের কথা শুনে নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন।

সেই নিবেদিতাও একদিন চলে গেলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মা বেদনায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, তুমি বিদেশিনী মেয়ে, কেন আমাকে কাঁদাতে এসেছিলি ? গীর্জেয় গিয়ে যীশু-মাতা মেরীকে না দেখে কেন তুমি আমাকে দেখতে এলি ?

॥ ২১ ॥

মা জয়রামবাটি গেছেন কতবার। যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই চলে গেছেন।

জয়রামবাটির লোকেরা যেমন তাঁকে শ্রদ্ধা করে আবার কিছু কিছু লোক নিন্দা করতেও পিছপা নয়। মায়ের কিন্তু প্রশংসাতেও আনন্দ নেই, নিন্দাতেও দুঃখ নেই।

সেবার মা জয়রামবাটিতে আছেন। এক যুবক এসে প্রণাম করল মাকে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, এসো বাবা। তুমি কোত্থেকে এসেছ?

যুবক বলল, আমি জয়রামবাটিরই ছেলে।

মা তাকিয়ে দেখলেন যুবকের মুখ বিষাদ-ভারাক্রান্ত, চোখ অশ্রুতে ছলছল। বুঝতে পারলেন যুবকটি সাংসারিক যাতনায় পিষ্ট। জিজ্ঞেস করলেন, কি চাও বাবা তুমি?

যুবক বলল, আমার কি চাইবার অধিকার আছে মা? আমি দীক্ষা চাই।

মা বললেন, বেশ তোমাকে দীক্ষা দেবো, সেজন্য ভাবনা কি?

যুবককে মা দীক্ষা দিলেন। একটি অশান্ত হৃদয় তার হারানো শান্তি ফিরে পেল।

জয়রামবাটিতে মায়ের সংসার কি ছোট? নিজের জন্য চিন্তা যত না করেন তার চেয়ে বেশী চিন্তা করেন ভাইদের সংসারের জন্য। তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য।

প্রসন্নর প্রথম পক্ষের দুটি ছোট ছোট মেয়ে, নলিনী আর মাকু। প্রসন্নর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সেই মেয়ে দুটির দেখাশোনা মোটেই করতে পারতো না। সারদামণির ওপরেই ছিল তাদের ভার। তাই তো

সারদার কলকাতায় থেকেও মনে শান্তি নেই। মাঝে মাঝেই আসতে হয় তাঁকে জয়রামবাটিতে।

নলিনী আর মাকু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। পরলোকগত ভাই অভয়ের মেয়ে রাধারাণী বা রাধুও এখন বেশ ডাগরটি হয়ে উঠেছে। ওদের সবারই জন্যই মায়ের যত ভাবনা।

ভায়েরা সব আলাদা হয়ে গেছে। সারদানন্দ এসে সব ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন ঝগড়াঝাটি না করে মিলে মিশে থাকতে।

কিন্তু সারদানন্দের কথা ওরা মানছে কই! একদিন তো কালীতে বরদাতে হাতাহাতি লেগে গেল। নিজের দাওয়ায় বসে মা কিছুক্ষণ দেখলেন। ক্রমেই যখন তা বাড়তে লাগল তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। কাছে ছুটে গিয়ে দু ভাইকেই বকতে লাগলেন। তাতেও যখন কোন ফল হল না তখন দুজনকেই ঠেলে সরিয়ে দিলেন। গজরাতে গজরাতে দুজনেই যার যার ঘরে চলে গেল। মা-ও আবার নিজের দাওয়ায় গিয়ে বসলেন।

হায়রে মরার পর সব পড়ে থাকবে, তার জন্য এত! কি খেলাই খেলছেন মহামায়া! ভাইদের কাণ্ড দেখে দুঃখেও মায়ের মুখে করুণার হাসি ফুটে উঠল।

ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট অভয়। সে-ই যা একটু লেখাপড়া শিখেছিল। ডাক্তারীও পাস করেছিল। সবার চেয়ে তাঁর স্বভাব চরিত্র ও আলাপ ব্যবহার ছিল ভাল। কিন্তু সে-ই অকালে চলে গেল। অন্য ভাইগুলি যেন কেমন।

সারদার মনে হয়, কি বিচিত্র এই সংসার।

বরদাপ্রসাদের স্ত্রীকে একদিন বললেন মা, তোরা একটা-একটা ছেলে নিয়ে ন্যাতা জেবড়া হয়ে থাকিস, মানুষ করতে পারিস নে। আর আমার হাজার ছেলেমেয়েকে মানুষ করে দিতে হচ্ছে।

সত্যি তো মার হাজার হাজার ছেলেমেয়ে। সবার জন্যই তো তাঁর ভাবনা।

গৌরী-মা একবার দুর্গা বলে একটি মেয়েকে নিয়ে এলেন। মেয়েটি যেন রূপে গুণে সত্যি মা-দুর্গা। আর গৌরী-মা তাকে কি সুন্দর ভাবেই না মানুষ করে তুলেছেন!

কি ভাগ্য মেয়েটির!

ওর মা নেই। ভাইয়েরা একটা যা-তা পাত্রের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে চাইছিল। গৌরী-মা ওকে রক্ষা করলেন। ওকে নিয়ে লুকিয়ে বেড়ালেন নানা জায়গায়।

ওর জীবনটাই মাটি হয়ে যেত। গৌরী-মা ওকে পুরী নিয়ে গিয়ে জগন্নাথের সঙ্গে মালা বদল করে সন্ন্যাসিনী করে দিলেন। মেয়েটি লেখাপড়া শিখল। একটা সংস্কৃত পরীক্ষা দেবার জন্যও তৈরী হতে লাগল।

দুর্গাকে দেখে মা বড় খুশী। রাধুর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, গৌরদাসী কেমন মেয়ে তৈরি করেছে, আর আমি কি করছি?

মা বলতেন, আমার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস, কারুর দোষ দেখতে পারি না।

একদিন সকালে কলকাতা থেকে কয়েকজন ভক্ত এসে হাজির। খুব সেজেগুজে এসেছে। এক গাদা ফল নিয়ে এসেছে মার জন্য। কিন্তু অর্ধেক ফল পচে গেছে। একটু ভালভাবে দেখেশুনে আনবে সেদিকে খেয়াল নেই।

মা বিরক্ত হলেন একটু।

কলকাতায় আছেন মা।

সামনের কুলি-বাস্তিতে এক মজুর তার স্ত্রীকে মারছে। সময় মত সে ভাত রেঁধে দেয়নি এই হল সেই বউটির অপরাধ। প্রথমে চড় ঘুষি। খুব মারলে। তাতেও গায়ের জ্বালা মিটল না। শেষে মারল লাথি। সেই লাথির চোটে বউটা কোলের ছেলেসুদ্ধ ছিটকে উঠোনে গিয়ে পড়ল।

তাতেও কি রেহাই আছে! সেখানে গিয়েও লোকটা বউকে লাথি মারতে লাগল। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে বউটা কাঁদতে লাগল চিৎকার করে।

মা জপে বসেছিলেন। কাতর কান্নার শব্দে তাঁর জপ বন্ধ হয়ে গেল। শরীর তাঁর সুস্থ নয়, তবু রেলিং ধরে কি হয়েছে তা দেখবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

ব্যাপার দেখে মায়ের শরীর কাঁপতে লাগল। যে মায়ের গলা সহজে কেউ শুনতে পায় না, তাঁর গলায় কি তেজ! বললেন, ওরে বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি?

লোকটি মাথা তুলে তাকাল মার দিকে। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই মাথা নীচু করল।

মারধোর তখনই বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরই বউকে টেনে তুলে নিয়ে গেল ঘরে।

মায়ের কথায় কি যেন জাদু আছে!

॥ ২২ ॥

রাধু বড় হয়েছে। মা এবার তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন ঠিক করলেন। পালিতা কন্যা, কিন্তু নিজের পেটের সন্তানের চেয়েও মায়া তার ওপর বেশী। তাই চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে রাধুর ভাল ঘরে বিয়ে হয়।

কিন্তু মুখের কথায় তো বিয়ে হয় না। টাকারও দরকার অনেক। তাই মা খুব ভাবনায় পড়ে গেলেন। সারদানন্দ তখন এগিয়ে এলেন মাকে সাহায্য করবার জন্য। বললেন, ভাবনা কি। আমি টাকা তুলে দেবো।

মায়ের ভক্তদের কাছ থেকে সারদানন্দ অনেক টাকা তুললেন। বেশ টাকাপয়সা খরচ করে রাধুর বিয়ে দেওয়া হল।

নলিনী আর মাকুও বড় হয়ে গেছে। তাদেরও বিয়ে দেওয়া দরকার। ভালোর বেলা না হোক, মন্দের বেলায় গাঁয়ের লোকেরা পঞ্চমুখ। তারা মাকে বলতে ছাড়বে না।

মা তাদের দিকেও নজর দিলেন। নলিনী আর মাকু দুবোনেরই বিয়ে হয়ে গেল একে একে। মার মাথার বোঝা যেন হালকা হল একটু।

মার একটি ভক্ত মেয়ে রাধুর জন্য একজোড়া শাঁখা নিয়ে এসেছে। কিন্তু রাধুর হাতে যায় না, শাঁখা ছোট। রাধু ছেলে-মানুষের মত কান্না জুড়ে দিল। ভক্ত মেয়েটিরও মন খারাপ হয়ে গেল খুব। তারও দুচোখ ছলছল করে উঠল।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে রে? কান্নাকাটি কেন?

রাধু বলল, এত সুন্দর শাঁখা দিদিমণি এনেছে, কিন্তু হাতে যে উঠছে না, ছোট হয়েছে।

মা এগিয়ে গেলেন কাছে। বললেন, দেখি, শাঁখা কেমন ছোট হয়েছে? তোদের যে কথা।

মা নিজেই রাধুকে শাঁখা পরাতে বসলেন। টিপে ধরলেন রাধুর হাত।

ওমা একি! দেখতে দেখতে শাঁখা রাধুর হাতে উঠে গেল।

রাধু এবার হাসতে লাগল ছেলেমানুষের মত। সুন্দর শাঁখা পরে তার কি আনন্দ। হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শাঁখা দেখতে লাগল আর সকলকে দেখাতে লাগল।

মা বললেন, নতুন সুন্দর শাঁখা পরেছ, ঠাকুরকে প্রণাম করো, আমাকে প্রণাম করো, ওকেও প্রণাম করো।

রাধু তাই করল। কিন্তু ভক্ত মেয়েটিকে প্রণাম করতে যেতেই সে পা সরিয়ে নিল। বলল, সেকি, আমি নীচু জাত, আমাকে প্রণাম করবে কেন?

মা বললেন, ভক্তের আবার জাত কি? তারা সব এক জাত। উঁচুনীচু বলে কিছু নেই।

রাধু ভক্তমেয়েটিকে প্রণাম করতে সে-ও রাধুকে প্রণাম করল। মা হাসলেন। বললেন, প্রণামটা ফিরিয়ে দিলে?

এত আদরের রাধু। বিয়ের পর সেই রাধুই পর হয়ে গেল। কি বিচিত্র সংসার!

সেবার কোয়ালপাড়ায় মার অসুখ। রাধুর শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এল তাকে নিয়ে যাবার জন্য। মার ইচ্ছা নেই তাকে এসময়ে পাঠায়। রাধুর কিন্তু ভয়ানক ইচ্ছে। সে মার কাছে এসে বলল, আমি যাচ্ছি।

মা বললেন, তুই যাচ্ছিস, আমাকে দেখবে কে?

রাধু বলল, তোমাকে দেখবার জন্য কত ভক্ত আছে। আমাকে দেখবার স্বামী ছাড়া কেউ নেই।

মার অনুমতি নেওয়াও আর দরকার মনে করল না রাধু। পালকিতে গিয়ে উঠল।

অথচ এই রাধুর জন্য কি কম করেছেন মা?

একবার অসুখ করল রাধুর। চিন্তায় মার মুখখানি মলিন হয়ে

গেল। কিসে রাধু ভাল হবে তার চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষদের ব্যস্ত করে তুললেন।

যোগেন-মার কিন্তু এতটা ভাল লাগে না। তিনি মনে মনে ভাবেন, মার এমন ধারা কেন? ঠাকুর অমন ত্যাগী ছিলেন আর মাকে দেখছি ঘোর সংসারী।

রাধুর মা পাগলীই কি মাকে কম জ্বালিয়েছে এজন্য? সব সময়েই কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখেছে মাকে। বলেছে, তোমার তো আরো অনেক ভক্ত আছে, তাদের ছেলেমেয়ে একটি লাওগে যাও। তুমি কি আমার মেয়েকে নিবে বলে জন্মেছিলে? এই বলে কত গালাগালি দিয়েছে।

মা নীরবে সব সহ্য করেছেন। কোন সময় শান্তভাবেই বলেছেন, তুই যে আমাকে এত বাপ-অন্ত মা-অন্ত গাল দিচ্ছিস, তুই কি আমাকে খুব সামান্য লোক মনে করিস?

সুরবালা মুহূর্তেই সুর পালটে নেয়। চোখ কপালে তুলে বলে, ওমা, তোমাকে কখন আমি অমন করে গালাগালি দিলাম?

পাগল হলে কি হবে, ওদিকে সেয়ানা।

মা বললেন, আমি যদি তোর অপরাধ নিই, তা হলে কি তোর রক্ষা আছে? আমি যে কদিন বেঁচে আছি তোরই ভালো। তোর মেয়ে তোরই থাকবে। যে কদিন না মানুষ হয় সে কদিনই আমি। নইলে আমার মায়া কাটাতে কতক্ষণ।

একদিন সুরবালাকে মা একখানি গরদের কাপড় দিলেন। সেই কাপড়খানি পেয়ে পাগলী কি খুশী! কিন্তু পরমুহূর্তেই রাধুকে নিয়ে কি একটা কথা উঠল আর অমনি কাপড়টা ছুড়ে মারল মার গায়ে। বললে, আমি চাই না তোমার কাপড়। তোমার ভালো ভাজদের দাও গে।

সেই রাধুর ছেলে হল। কোয়ালপাড়ার মত বুনো জায়গায় জন্ম হয়েছে বলে মা সেই ছেলের নাম রাখলেন বনবিহারী।

মা রাধুর ছেলেকেও কি কম ভালবাসেন? রোজ সকালে গান গেয়ে ঘুম ভাঙান।

ছেলে হওয়ার সময় খুব কষ্ট পেল রাধু। তার অনেকদিন পরও শরীরের দুর্বলতা গেল না। দাঁড়াতে পারে না, বসে বসে চলাফেরা করে।

সেজন্য কি মার চিন্তা কম?

অনেক ওষুধপত্র এনে রাধুকে খাওয়ালেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না।

অসুখ সারাবার জন্য আফিং ধরল রাধু। কিন্তু মাত্রাটা দিল ভয়ানক বাড়িয়ে। মা চেষ্টা করলেন যাতে রাধু আফিংয়ের মাত্রা কমায়। কিন্তু সে কি আর মার কথা শোনে?

মা একদিন তরকারি কুটছেন, আফিংয়ের জন্য রাধু হাতে পায়ে ভর দিতে দিতে মার কাছে এসে বসল। মা বিরক্ত হয়ে বললেন, রাধি, তোকে নিয়ে আর পারিনে। তোর জন্য আমার ধর্মকর্ম সব গেল। এত খরচপত্র কোথা থেকে যোগাই বল্ দেখি।

রাধু রেগে উঠল। তরকারির ঝুড়ি থেকে একটা বড় বেগুন তুলে নিয়ে মার পিঠে মারল দুম করে।

মা চিৎকার করে উঠলেন। দেখতে দেখতে পিঠের ঐ জায়গাটা ফুলে উঠল।

তবু রাধুর ওপর মার কোন রাগ নেই। মনে মনে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলেন, ঠাকুর, ওর দোষ নিও না। ও অবোধ। নিজের পায়ের ধুলো নিয়ে মাখিয়ে দিলেন রাধুর মাথায়-কপালে। বললেন, রাধি, তুই কি বুঝবি, ঠাকুর আমার এই শরীরকে কোনদিন একটু কষ্ট দেন নি। আর তুই এমন কষ্ট দিচ্ছিস? তুই কি বুঝবি আমি কে?

আর কোন অভিযোগ নেই মার। মা করুণাময়ী।

॥ ২৩ ॥

নলিনী আর মাকুকে নিয়েও কি জ্বালা কম?

ভাল ঘরেই নলিনীর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তবু সে সুখী নয় সুখ মানুষ জোর করে পেতে পারে না। ভাগ্য থাকা চাই।

নলিনী রাগ করে একদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এল। বাড়ির সবাই কত করে বলতে লাগল, কিছুতেই সে ফিরে যেতে রাজী হল না।

মেয়ের কি গোঁ। যাবো না, যাবো না, হাজার বললেও যাবো না আমি।

মায়ের কথাও সে অমান্য করল।

একদিন রাত্রে বাড়ির সবাই ঘুমুচ্ছে, এমনসময় নলিনীর স্বামী গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হল।

ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল সকলের। নলিনী বুঝতে পারল তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। সে অমনি ঘরে খিল এঁটে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

সবাই মিলে কত ডাকাডাকি। কিছুতেই নলিনী দরজা খুলল না। ভয় দেখাতে লাগল—সে আত্মহত্যা করবে।

মা সারদা সারা রাত লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসে রইলেন নলিনীর ঘরের দরজায়।

যেতে হবে না শ্বশুরবাড়িতে, দরজা খোল্।

প্রতিজ্ঞা করে বলার পর নলিনী দরজা খুলল। তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে।

মা এবার লণ্ঠনটি নেবালেন। অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে লাগলেন ঠাকুরের নাম।

তবু কি নলিনীর রাগ কমে? সারাটা দিন সেদিন উপোস করে

রইল। মা কত সাধাসাধি করলেন, কিন্তু কিছুতেই জেদ ভাঙল না মেয়ের। মা রাগ করে বললেন, আমাকে কখনো আর পিসীমা বলে ডাকবি না, বলে রাখলাম। ডাকলে আমি তোদের সবাইকে ছেড়ে চলে যাব। জানিস, এ দেহ আমি এখনই ছেড়ে যেতে পারি।

মাকুর একটি ছেলে হল। ছেলেটির নাম নেড়া। সেই ছেলেকে নিয়ে এল মাকু বাপের বাড়ি।

জয়রামবাটিতে আসার অর্থই হল সারদামণির ঘাড়ে পড়া। সব দায় যেন মার।

নেড়া কখন চান করবে—কখন দুধ খাবে সব কিছু মাকেই বলে দিতে হবে। মা-ই তদবির করবেন সব কিছুর।

যখনই জয়রামবাটিতে আসবে তখনই নেড়ার যত আবদার সারদামণির ওপর। মাকে কি চেনাই সে চিনেছে!

মাকু মাকে পিসী বলে ডাকে। নেড়াও ডাকে পিসী। যখন তখন মার ঘরে তার আনাগোনা। আর কি আবদার অত্যাচার!

মাকে ভালও বাসে খুব। মার দাঁত পড়ে গেছে। নেড়া জিজ্ঞেস করে, পিসী, তোমার দাঁত কোথায়?

সারদা জবাব দেন, পড়ে গেছে।

হাসতে হাসতে নেড়া বলে, তা হলে আমার দুটো দাঁত নাও।

নেড়া যত বড় হয় ওর বুদ্ধিও তত বাড়তে থাকে। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ওর বাড়ে।

জয়রামবাটিতে এসে কোত্থেকে কতগুলো গুলঞ্চ ফুল কুড়িয়ে এনে মার পায়ে ঢেলে দিল। বলল, দেখ পিসীমা, কেমন ফুল।

তারপর ফুলগুলো কপালে ঠেকিয়ে পকেটে রেখে দিল। কেমন কৌশল করে মায়ের পায়ের ধুলো নিল সে!

সেই নেড়ার ডিপথিরিয়া হল। মা তখন কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা আশ্রমে। নেড়ার অসুখের খবর শুনে মায়ের কি দুশ্চিন্তা!

ছেলে যাতে ভাল হয় তার জন্য ঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনা করতে লাগলেন।

ডাক্তার আয়েঙ্গার নেড়ার চিকিৎসা করছেন। ইনজেকসন আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছেন কলকাতায়। মা বৈকুণ্ঠ মহারাজকে রোগীর দেখাশোনা করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সন্ধ্যাবেলায় খবর এল, রোগীর অবস্থা ভাল নয়। মা ভক্তদের বললেন, পালকি ঠিক করে রাখো। কাল সকালেই আমি রওনা হয়ে যাবো। যদি গিয়ে দেখতে পাই।

কিন্তু পরদিন মায়ের রওনা হবার আগেই এসে হাজির হলেন বৈকুণ্ঠ মহারাজ। তাঁকে দেখেই আর্তনাদ করে উঠলেন মা, তবে কি ছেলে নেই?

বৈকুণ্ঠ মহারাজ ছলছল চোখে বললেন, না, সে নেই।

ব্যাকুল হয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন, এখন গেলে দেখতে পাবো?

বৈকুণ্ঠ মহারাজ বলল, না, ওকে নিয়ে গেছে।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে মা বললেন, হয় তো কোন ভক্ত এসে জন্মেছিল। নইলে তিন বছরের ছেলের এত বুদ্ধি! কেমন করে আমাকে পূজো করলে। হয় তো এই ওর শেষ জন্ম।

ছেলের জন্য মাকু যা কেঁদেছে, তার চেয়ে কি কম কেঁদেছেন মা? মাকু কেঁদেছে চিৎকার করে, আর মা কেঁদেছেন নীরবে।

নিজের ছেলেমেয়ে হয় নি। কিন্তু ছেলেমেয়ে মরলে যে কি কষ্ট তা হাড়ে হাড়ে বুঝলেন মা।

একটি স্ত্রী-ভক্ত এসেছে মার সঙ্গে দেখা করতে। তার সঙ্গে একটি ছোট ছেলে। মা জানেন স্ত্রীলোকটির কোন ছেলে নেই। তাই জিজ্ঞেস করলেন, এটি কে!

স্ত্রী-ভক্ত বলল, আমারই এক পড়শীর ছেলে। ওর ওপর বড় মন পড়ে গেছে। ভাবছি ওকে নিজের ছেলের মত মানুষ করবো।

মা বারণ করলেন, অমন কাজও করো না। যার ওপর যেমন

কর্তব্য তেমনি শুধু করে যাবে। এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে ভালোবেসো না। ভালোবাসলেই অনেক দুঃখ।

কিন্তু এই দুঃখকে এড়ানো কি এতই সহজ! কেউ ভালোবেসে দুঃখ পায়, কেউ শুনেও দুঃখ পায়।

মাঝি-বউকে মা বড় ভালবাসেন।

সেই মাঝি-বউ অনেকদিন আসছে না। মা মাঝে মাঝেই তার কথা অনেককে জিজ্ঞেস করেন।

এরপর একদিন এল মাঝি-বউ। মাথায় তার বোঝা। রাস্তায় জিনিস বিক্রি করতে বেরিয়েছে। মাথার বোঝা নামিয়ে মাকে প্রণাম করল। তার মাথার চুল উস্কো খুসকো, মুখখানা বিষণ্ন। মা জিজ্ঞেস করলেন, তোর কি হয়েছে রে!

মুহূর্তে জলে ভরে উঠল মাঝি-বউর চোখ। বলল, আমার সেই রোজগেরে ছেলেটি মারা গেছে মা।

সে কথা শুনে মার গলার স্বর কেঁপে উঠল। বললেন, বলিস কিরে! কি হয়েছিল ওর?

মাঝি-বউ বলল, হঠাৎ কি হল, ডাক্তার রোগ ধরতে পারল না।

বারান্দার খুঁটিতে মাথা রেখে মা গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। সেই কান্না শুনে লোকজন চারদিক থেকে ছুটে এল।

ব্যাপার দেখে সবাই দিশেহারা, মাঝি-বউও স্তম্ভিত।

কিন্তু কি যে হল তার, মনের বোঝা যেন হালকা হয়ে এল। মা বুঝি তার সমস্ত দুঃখভার নিজের বুকে টেনে নিয়েছেন।

॥ ২৪ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সারদামণিকে বলেছিলেন, তুমি একটি ছেলের জন্য দুঃখ করছ কি গো! শেষে এমন হবে যে 'মা' ডাকে তিষ্ঠোতে পারবে না।

ঠাকুরের বাণী সফল হয়েছে। মার চারিদিকে কত ছেলে।

একটি ছেলে ফুল কুড়িয়ে আনে ভোরবেলায়। এনে মাকে পূজা করে। তার নামও সারদা। উত্তরকালে তার নাম হয়েছিল স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ।

সারদার সঙ্গে মা চলেছেন বর্ধমান হয়ে জয়রামবাটিতে। দামোদর পার হয়ে এসে পালকি খুঁজলেন। কিন্তু পালকি পাওয়া গেল না। গরুর গাড়িতে যাওয়া সুবিধাজনক নয়—কারণ পথ খুব খারাপ। পালকি না পাওয়ায় অগত্যা গরুর গাড়িই ভাড়া করতে হল।

মা গরুর গাড়িতে উঠলেন আর সারদা চলল গাড়ির আগে আগে লাঠি কাঁধে। পথঘাট খারাপ, তাই আগে আগে পথ দেখে না চললে বিপদ হতে পারে।

রাত তখন অনেক। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

হঠাৎ সারদা দেখতে পেল, বর্ষার জলে রাস্তার একটা জায়গা ভেঙে গেছে। এমন ভাবে ভেঙেছে যে গাড়ি চলা সম্ভব নয়। গাড়ির চাকা তো বসে যাবেই, তার ওপর ঝুঁকি লেগে মাও ভয়ানক আঘাত পাবেন।

ওদিকে গাড়ি থামিয়ে রাখাও চলে না। কারণ তাল কেটে গেলে মার ঘুম ভেঙে যাবে। তাছাড়া দেরিও হয়ে যাবে অনেক।

কি করা যায়? একটু ভেবেই সারদা নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলল। গাড়িটা আরও এগিয়ে চলেছে। আর একটু গেলেই চাকা বসে যাবে। সারদা তাড়াতাড়ি সেই ভাঙা জায়গায় উপুড়

হয়ে পড়ল। গাড়োয়ানকে বলল, আমার পিঠের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাও।

গাড়োয়ান সে কথা শুনে হকচকিয়ে উঠল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মায়ের। তখন আকাশে চাঁদের আলো ছিল। মা মুখ বাড়িয়ে দেখেই সব বুঝতে পারলেন। চিৎকার করে গাড়োয়ানকে বললেন, গাড়ি থামাও—থামাও শীগ্‌গির।

গাড়োয়ান গাড়ি থামাতেই মা নেমে পড়লেন। সারদাকে ধমক দিয়ে বললেন, উঠে এসো—উঠে এসো ওখান থেকে। তুমি কি মরবে আমার জন্য?

সারদা উঠে এল। মা হেঁটেই সেই ভাঙা জলা জায়গাটা পার হয়ে গেলেন। সারদা আর গাড়োয়ান দুজনে ঠেলে খালি গাড়িটা পার করে নিয়ে গেল।

মা আবার গাড়িতে উঠলেন। একটু আগে সারদাকে বকেছিলেন, এবার বললেন, তুমি না থাকলে এত রাত্রে এই নির্জন জায়গায় আমাকে কে দেখত?

শ্রাবণ মাস। বৃষ্টিতে পথ-ঘাট পিছল হয়ে গেছে। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে।

সেই সময়ে জয়রামবাটিতে এসে পৌঁছল এক সন্ন্যাসী-ছেলে। অনেকদিন পর সেই ছেলেটিকে দেখে মা খুব খুশী হলেন। বললেন, অনেককাল পরে যে এলে। যাক, ভালই হয়েছে। ক'দিন বাজার হয় নি। আজ কিছু বাজার করে নিয়ে এসো।

সে কথা শুনে সন্ন্যাসী-ছেলেটি খুব খুশী। মা তাকে বাজার করতে বলেছেন। কি ভাগ্য।

সন্ন্যাসী-ছেলে বাজার করতে গেল। আনন্দে অনেক কিছু জিনিস কিনে ফেলল সে। তার ওজন এক মণের কম হবে না। দোকানদার বলল, একটা মুটে ডেকে দি।

কিন্তু সন্ন্যাসী-ছেলে ভাবল, মা তো তাকে মুটে নিতে বলেন নি।

আবার যদি রাগ করেন। তাই সে বলল, না, মুটের দরকার নেই, আমিই বয়ে নিয়ে যেতে পারবো। ঝুড়িটা আমার মাথায় তুলে দিন।

ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে সন্ন্যাসী-ছেলে দেখে বেজায় ভারী। নিয়ে চলাই মুশকিল। তার ওপর আবার বৃষ্টি নামল। ছাতা সঙ্গে ছিল। তাই ছাতাটা মেলে ধরল ঝুড়ির ওপর। ঝুড়িতে আটা ময়দা আছে, সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে যে।

মাথায় বোঝা, শূন্যে বৃষ্টি, পায়ের নীচে পথ পিছল; সন্ন্যাসী-ছেলে খুবই মুশকিলে পড়ল। মনে মনে মাকে স্মরণ করতে লাগলো, মাগো, শক্তি দাও।

মুহূর্তে যেন বোঝাটা হালকা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী-ছেলের চলতে কোন অসুবিধাই হল না।

বাজারের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে সে মার বাড়িতে এসে পৌঁছল। এসে দেখে মা ঘরের বারান্দায় চঞ্চল ভাবে পায়চারি করছেন। এদিক ওদিক যাচ্ছেন আর বলছেন আপন মনে, কেন একটা মুটে নিতে বললুম না।

ভক্তছেলের কষ্টের কথা মনে করে অস্থির হয়ে উঠেছেন সারদামণি। সমস্ত ভার যেন নিজের ঘাড়ে তুলে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

মার পায়ের কাছে বোঝা নামিয়ে রাখল সন্ন্যাসী-ছেলে। মা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। ভৎসনা করে বললেন, এত বড় বোঝা নিয়ে এলে, একটা মুটে নিলে না কেন? সবই কি আমাকে বলে দিতে হবে? ইস, তোমার কি কষ্ট হয়েছে!

সন্ন্যাসী-ছেলে বলল, না মা আমার কোন কষ্ট হয় নি।

ছেলে হওয়ার পর রাধুর যে অসুখ করল, সেই অসুখ আর সারে না। এক রোগ থেকে আর এক রোগ হয়েছে। কিন্তু সব দায় যেন মার। মাকেই সব দিক সামলাতে হয়।

জয়রামবাটি থেকে মা আর নড়তে পারছেন না। ছেলে একটু শক্তসমর্থ না হলে রাধু তাকেই বা কি ভাবে সামলাবে?

মা এক বছরের ওপর আটকে রইলেন পাড়াগাঁয়ে। কতরকম ঝড়-ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হচ্ছে তাঁকে। তবু থাকতে হচ্ছে।

রাধুরও রোগ সারে না, সুরবালারও পাগলামি সারে না।

পাগলী কি মাঝে মাঝে কম অত্যাচার করে মার ওপর? আবার সময় সময় তার আদর উথলে ওঠে। বলে, ও ঠাকুরঝি, এসো তাস খেলি।

মা বলেন, না, ও সব আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু পাগলী কি শোনে? জোর করে মাকে টেনে নিয়ে খেলতে বসে। আশু, নলিনী, সুরবালা আর মা এই চারজনে খেলতে শুরু করে। আশু আর মা একদিকে, সুরবালা আর নলিনী আর এক দিকে।

গ্রাবু খেলা। একদিন মা প্রথমেই একখানা ছক্কা পেলেন। পাগলী তো রাগেই অস্থির। পাঁচবার চেষ্টা করার পর তবে একটি পঞ্জা পড়ল। রাগের চোটে হাতের তাস ফেলে দিল পাগলী। বলল, তোমরা বুঝি খালি জিতবে ঠাকুরঝি?

মা বললেন, আমরা সৎপথে থাকি, সাত্ত্বিক। আমরা জিতবো না তো কি তোরা জিতবি?

তাতে সুরবালার আরো রাগ। সে খেলবেই না। অনেক বলে কয়ে আবার তাকে বসানো হল।

শুধু কি এই! কত দিক দিয়ে পাগলী তাঁকে জ্বালায়।

একদিন কে একজন সুরবালাকে বলল, তোমার জামাই তো বাঁড়ুয্যেদের পুকুরে ডুবে গেছে।

অমনি সে পুকুরে গিয়ে জলে ডুব দিয়ে জামাইকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু অনেক খুঁজেও যখন পেলে না তখন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল বাড়িতে।

ভিজে কাপড়ে উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়ে চিৎকার করে বলল, ওগো ঠাকুরঝি, আমার জামাই পুকুরে ডুবে গেছে। আমার উপায় কি হবে গো?

সুরবালার চিৎকারে লোকজন ছুটে এল। মা-ও এলেন।

সুরবালা তাঁকে দেখে বলল, ঠাকুরঝি, এসব তোমার কাজ। আমার সুখ তোমার দুচোখের বিষ। চালাকি চলবে না। আমার জামাইকে ফিরিয়ে এনে দাও।

এমন সময় গাঁয়েরই একটি লোক এসে বললে, মন্মথ বেনেদের দোকানে তাস খেলছে, এই মাত্র দেখে এলাম।

মা বললেন, যাও ওকে ডেকে নিয়ে এসো।

একটু পরেই রাধুর স্বামী মন্মথ এসে উপস্থিত হল। বলল, কেন, কি হয়েছে? আমি তো তাস খেলছিলাম।

পাগলী লজ্জা পেল। কিন্তু মনে মনে গজরাতে লাগল। সবাই শুধু আমার পেছনে লাগবে।

একদিন মা তরকারি কুটছেন, হঠাৎ এসে হাজির হল সুরবালা। বলল, তুমিই তো আফিং খাইয়ে রাধুকে বশ করেছো। আমার মেয়েকে, নাতিকে আমার কাছে পর্যন্ত যেতে দাও না।

মা বললেন, তোর মেয়ে আর নাতিকে রাখবার আমার কি দায় পড়েছে? নিয়ে যা না।

দাঁড়াও দেখাচ্ছি—বলে পাগলী ছুটে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই হাজির হল একটি চেলা কাঠ হাতে নিয়ে। সেই কাঠ তুলে মাকে মারে আর কি!

তাই দেখে মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওঠো, কে আছ, পাগলী আমাকে মেরে ফেললে।

একটি ভক্তমেয়ে ছুটে এসে তাড়াতাড়ি পাগলীর হাত থেকে চেলা কাঠ ছিনিয়ে নিল। ঠেলে তাকে বের করে দিল ঘর থেকে।

মা বললেন, পাগলী, তুই কি করতে গেছিলি? দেখবি তোর হাত খসে পড়বে।

কিন্তু তখনই মা জিভ কাটলেন। ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললেন, ঠাকুর, এ কি করলাম! তুমি দেখো। তুমি ওকে রক্ষা কোরো।

আর একদিন।

রাধু অসুস্থ। পাশে তার পাগলী-মা বসে আছে। অথচ রাধু চায় না তার পাগলী-মা পাশে বসুক। তাই বলল, তুমি যাও না।

পাগলী তবু গেল না।

মা সারদামণি তাকে সরিয়ে দেবার জন্য তার গায়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে বললেন, সত্যি তো, তুমি এখন যাও না।

এই করতে গিয়ে হাতটা গা ফসকে পাগলীর পায়ে লাগল। অমনি পাগলী চিৎকার করে উঠল, কেন তুমি আমার পায়ে হাত ঠেকালে? আমার কি হবে গো?

গালাগালি করে সুরবালা প্রায় মারতে আসে মাকে। মা তো হেসেই খুন।

কি বিচিত্র সংসার নিয়ে মা বাস করছেন?

॥ ২৫ ॥

মা গ্রামের মেয়ে। আধুনিক শিক্ষার আলোক পান নি। কিন্তু গ্রামের কোন কুসংস্কার বেঁধে রাখতে পারে নি তাঁর মনকে।

একদিন অল্পবয়সী দুজন বিধবা মেয়ে এসেছিল মায়ের কাছে। তাদের পরনে সাদা থান ধুতি। মা তাদের বললেন, এই বয়সেই এই থান ধুতি পরেছো কেন? এতে মনকে তাড়াতাড়ি বুড়ো করে দেবে। কোন কাজই যে তা হলে করতে পারবে না।

নিজের বাক্স থেকে মা দুজনকে দুখানি শাড়ি বের করে দিলেন।

মা নিজেও পাড়ওয়ালা শাড়ি পরতেন। কামারপুকুরে এজন্য সারা গাঁয়ে টি-টি পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেজন্য ভয় পান নি সারদাদেবী। নিন্দুকের দল যখন পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল তখন এগিয়ে এসেছিল লাহাদের বোন প্রসন্নময়ী। বলেছিল, একি তোমাদের মত সাধারণ মেয়ে! এ দেবী, ঈশ্বরী।

জয়রামবাটির রাঁধুনি বড় খুঁতখুঁতে। একে জাতে বামুন তার ওপর আচার নিষ্ঠার বড় বাড়াবাড়ি।

একদিন শীতকালে রাত্রিবেলা এসে বলল, কুকুর আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে, চান করে আসি।

মা বললেন, এত রাতে চান করো না। হাত-পা ধুয়ে এসে কাপড় ছেড়ে ফেলো।

কিন্তু রাঁধুনির মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। বলল, তাতে কি হবে?

মা বললেন, তা হলে গঙ্গাজল নাও।

তাতেও রাঁধুনির মন পরিষ্কার হয় না। সে ইতস্ততঃ করতে থাকে। তখন মা বললেন, তবে আমাকে ছোঁও।

প্রৌঢ় বয়সে শ্রীশ্রীমা
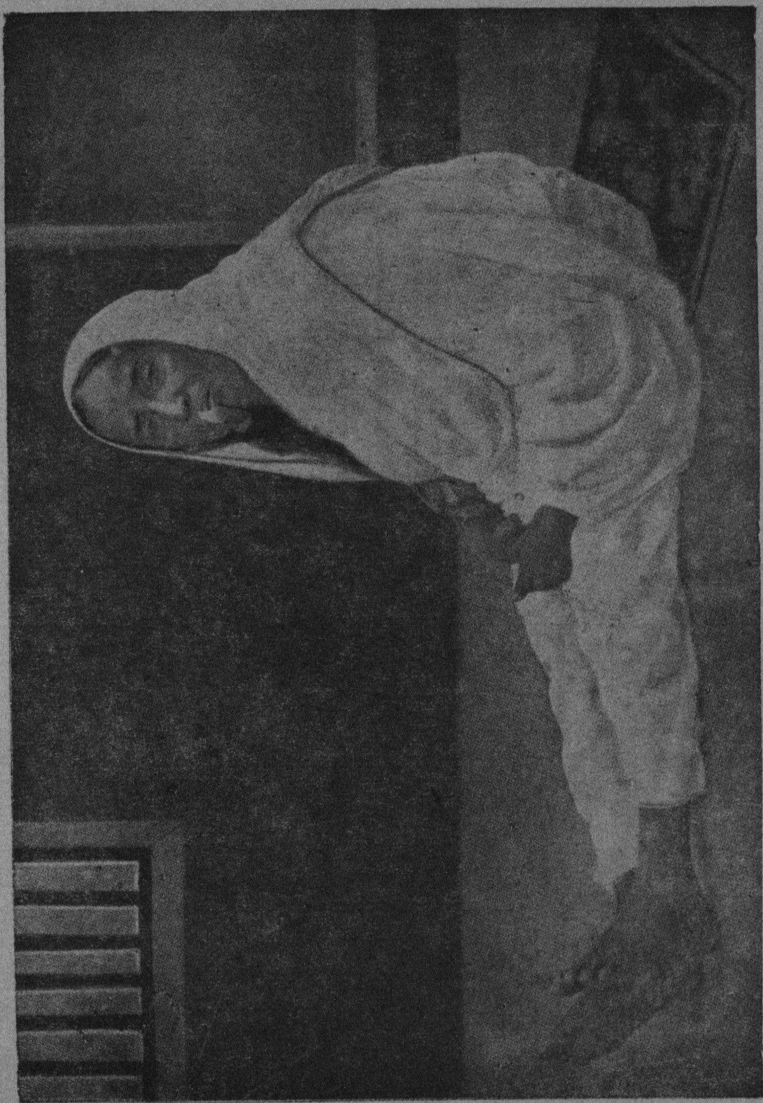
মনের কত জোর থাকলে একথা বলা যায়। মন কত পবিত্র হলে মুখ থেকে এমন কথা বেরুতে পারে!

একবার এক ভক্ত কিছু শাক-সবজি পাঠিয়েছিল একটি কুলি-মেয়ের হাত দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মা বললেন, এই সময়ে আর কি করে যাবি? এখানেই থাক।

সে রাত্রে মেয়েটি মার বাড়িতেই রয়ে গেল।

কিন্তু ম্যালেরিয়ার রোগী, মাঝরাতে এল প্রবল জ্বর। মেয়েটি বমি করতে লাগল।

মা ছুটে গিয়ে মেয়েটির সব বমি নিজের হাতে পরিষ্কার করে দিলেন। জল দিয়ে জায়গা ধুয়ে দিলেন। সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন মেয়েটির। একাজ করবার লোক আরও ছিল। কিন্তু যে আসবে সে-ই তো বমি দেখে মেয়েটিকে গালমন্দ দেবে। তাই নিজেই মা সব কিছু করলেন।

মা যাচ্ছেন একবার জয়রামবাটিতে। পথের পাশে শুকনো ডাল-পাতা কুড়িয়ে রান্না হচ্ছে। মাটির হাঁড়ি মা উনুনে চাপিয়েছেন। হঠাৎ হাঁড়ি ভেঙে গিয়ে ভাত মাটির ওপর পড়ে গেল।

সঙ্গের লোকেরা হা-হা করে উঠল। কি বিপদ! এখন ঠাকুরের ভোগ হবে কি দিয়ে?

মা কিন্তু মোটেই ব্যস্ত হলেন না। বললেন, ভাবনা কি, এতেই ঠাকুরের ভোগ হবে।

উপর থেকে মা পরিষ্কার ভাত তুলে নিলেন। তাই নিবেদন করলেন ঠাকুরকে সরল মনে।

সঙ্গের লোকদের বললেন, আজ যার ভাগ্যে যা মাপা আছে তাই খাবে।

একদিন একটি তন্তুবায়ের ছেলে বারান্দায় এসে বসেছে। মা তাকে দেখে বললেন, ঘরে এসে বসো বাবা।

ছেলেটি সংকুচিতভাবে বলল, না মা, এখানেই বসি। আমি ছোটজাত।

মা বললেন, কে বলেছে ছোটজাত? আমার ছেলে কখনো ছোটজাত হতে পারে? এসো, ঘরে এসো।

ছেলেটির দ্বিধা ও সংকোচ দূর হয়ে গেল। গিয়ে বসল ঘরের ভেতর।

মা তখন কলকাতায়। অসুস্থ।

একদিন একটি পার্শী যুবক এসে উপস্থিত হল। মায়ের সে দর্শন চায়।

তখন সবাইকে সহজে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হত না। তাই মায়ের ভক্তরা তাকে চলে যেতে বললেন। কিন্তু পার্শী যুবক কাতর অনুনয় করে বলল, অনেক দূর থেকে এসেছি, মায়ের দর্শন না পেয়ে যাবো না।

মায়ের কাছে খবর পাঠান হল। মা তখনই যুবকটিকে ডেকে পাঠালেন।

মায়ের দর্শন পেয়ে বিদেশী যুবক ধন্য। সে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মায়ের মুখের দিকে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চাও বাবা?

যুবক বলল, অনেক দূর সেই সিন্ধু দেশ—করাচী থেকে এসেছি এক আশা নিয়ে। সেই আশা পূরণ করো মা—আমাকে দীক্ষা দাও।

মা বিস্মিত হয়ে যান। এত দূর থেকে সেই বিদেশী যুবক এসেছে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে? যুবকের চোখে মুখে সত্যি যেন প্রবল এক আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের ভাব ফুটে উঠেছে।

এত দূর থেকে এত আশা নিয়ে এসেছে, তাকে কি তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন?

মা ভুলে গেলেন শরীরের অসুস্থতা। সবার মা সারদামণি—দীক্ষা দিলেন পার্শী যুবককে।

জীবনে সত্যের সন্ধান পেয়ে ধন্য হল অশান্ত যুবকের মন।

একদিন ভক্ত সন্তান এসে বসল মায়ের কাছে। বলল, মা, মন বড় চঞ্চল। কিছুতেই ঠিক হয় না।

মা বললেন, হোক না চঞ্চল, তাতে কি এসে যায়। ঝড় যেমন মেঘ উড়িয়ে নেয় তেমনি তাঁর নামে বিষয়মেঘও উড়ে যাবে।

•

মা সবাইকে একদিন পূজার পর প্রসাদ দিচ্ছেন। সবাই নিচ্ছে তা ভক্তিভরে। একটি মেয়ে প্রসাদ নেবার জন্য ডান হাত বাড়াল।

মা বললেন, ওরকম করে বুঝি প্রসাদ নেয়? দুই হাত পেতে অঞ্জলি করে প্রসাদ নাও। প্রসাদে আর হরিতে তফাত নেই? হরিকে পেলে কি এক হাতে ধরবে? না দুহাতে ধরবে?

কি চমৎকার কথা বললেন মা। এক হাত নিজের কাছে রেখে আর এক হাত ঈশ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিলে কি সম্পূর্ণ সমর্পণ করা হয়? দুটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ হলেই তো অন্তরে দীনতা আসবে। ভগবানকে লাভ করতে হলে অন্তরে দীনতা আনা চাই।

কি কৌশলে মা কত বড় একটি তত্ত্ব বুঝিয়ে দিলেন।

॥ ২৬ ॥

উড়িষ্যাবাসী এক সাধু এসে একবার হাজির হলেন কামারপুকুরে।

মা তাঁর খুব আদর-যত্ন করলেন। কয়েকদিন কামারপুকুরে থেকে সাধুর জায়গাটি এত ভাল লাগল যে তিনি ইচ্ছা করলেন এখানেই জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে যাবেন।

জায়গার চেয়েও বুঝি ভাল লাগল তাঁর মাকে। সময় সময় মার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠতেন। ভাবতেন, এ কণ্ঠস্বর যেন তাঁর জন্ম জন্ম পরিচিত।

সাধু বৃদ্ধ। তবু সারদামণিকে মা বলে ডাকেন। সবার মা যে সারদামণি। একদিন সাধু বললেন, মা গো, তোর কাছে আমাকে ঠাঁই দে মা। আর কদিন বা বাঁচবো, তোর কাছেই আমি থাকতে চাই।

মা গ্রামের লোকদের সেই কথা জানালেন। গ্রামের লোকেরা তখন জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা যোগাড় করতে লাগল। তারাই ভার নিল গাঁয়ে একটি কুড়েঘর তৈরী করবার।

ঘর তৈরি তো শুরু হল। কিন্তু বাধা পড়ল ভয়ানক। এমন বৃষ্টি নামল যে বৃষ্টি আর থামে না। তার ওপর শুরু হল ঝড়। ঘর তৈরির কাজ যতটা এগোয়, ততটা পিছিয়ে যায়। জিনিসপত্রও সব নষ্ট হয়ে যায়।

মার ভাবনা হল সবচেয়ে বেশী। তিনি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন—ঠাকুর, সাধুর ঘরখানি আগে তৈরী হতে দাও, তারপর যত পার বৃষ্টি দিও।

ঠাকুর বুঝি মায়ের প্রার্থনা শুনলেন। বৃষ্টি থেমে গেল। তৈরী হয়ে গেল সাধুর কুড়েঘর।

সেই কুড়েঘরে আশ্রয় নিয়ে সাধুর কি আনন্দ! দুহাত তুলে মাকে ও গাঁয়ের লোকদের আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

সাধুর মনস্কামনা পূর্ণ হল। তার শেষ বাসনাও পূর্ণ হল। কিছুদিন পর সাধু সেই ঘরেই দেহরক্ষা করলেন।

যোগেন-মা একদিন রসিকতা করে মাকে বলেছিলেন, মা, ঠাকুরের শিষ্যগুলো দেখ এক একটা বিরাট পুরুষ। যেন এক একটা সূর্য। আর তোমার শিষ্যগুলো সব চুনোপুঁটি।

মা হেসে জবাব দিয়েছিলেন, তা আর কি করবো বল! ঠাকুর নিজের বেলায় দেখে শুনে বাছাই করে রুই-কাতলাগুলো রেখে আমার জন্য যত চুনোপুঁটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাদের তো আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না। আমার কাছে সব গরিব গরবার দলই তো আসবে। কেষ্ট বিষ্টু আমি পাবো কোথায়? যারা যোগ্য তাদের তো ঠাকুর উদ্ধার করলেন। আর যারা অযোগ্য তাদের জন্যই তো তাদের এই মা রয়েছে।

একদিন একটি ভক্তছেলে এসে বলল, মা, যদি অনুমতি করো, তা হলে দিনকতক বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

মা বুঝলেন মঠের ওপর ছেলেটির অভিমান হয়েছে। তাই প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাবে!

ছেলেটি বলল, কাশী যাবার ইচ্ছা আছে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, টাকাকড়ি কিছু আছে সঙ্গে?

ছেলেটি বলল, না, টাকাকড়ির কি দরকার। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবো।

মা চুপ করে রইলেন। ছেলেটি বলল, তুমি অনুমতি দাও মা।

মা বললেন, মা হয়ে আমি কেমন করে অনুমতি দিই। দারুণ গরমে চারদিক ঝলসে যাচ্ছে। এতটা পথ হেঁটে যাবে, রাস্তাঘাটে পিপাসা পেলে কে দেবে একটু জল, ক্ষিদে পেলে কে দেবে দুটো অন্ন?

মার কথা শুনে মুহূর্তেই ছেলেটির মন যেন কেমন হয়ে গেল। তার আর যাওয়া হল না।

একবার পশ্চিম ভারত থেকে এলেন এক সন্ন্যাসী।

দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত। কাব্যশাস্ত্র তাঁর কণ্ঠস্থ। কারুর কাছে তিনি মাথা নত করেন না। মনে ভক্তি ও জ্ঞান প্রচুর। হাতে দণ্ড।

কিন্তু মার কাছে এসে দণ্ড ফেলে দিয়ে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন সেই সন্ন্যাসী। অভিমানের দম্ভ তাঁর ধুলায় লুটাতে লাগল।

মা তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, আহা, করছেন কি! আমাকে প্রণাম করছেন কেন?

কিন্তু সন্ন্যাসী কোন বাধা মানলেন না। প্রণাম করলেন। প্রণামে যে এত আনন্দ, এত তৃপ্তি তা বুঝি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের জানা ছিল না। পরম তৃপ্তিসহকারে বললেন, আশীর্বাদ দাও মা, ইহকালের এবং পরকালের।

মা পাশের এক ভক্তকে বললেন, সন্ন্যাসী বাবাকে ফল দাও।

ভক্তটি ভিতর থেকে তিনটি আম নিয়ে এসে মার হাতে দিল। মা তাই তুলে দিলেন সন্ন্যাসীর হাতে।

সন্ন্যাসী আম তিনটি তিনবার কপালে ছুঁইয়ে তাঁর ঝোলায় রাখলেন। তারপর ধীরে ধীরে যাবার পথে পা বাড়ালেন।

মায়ের হাতে ফল পেয়ে সন্ন্যাসীর কি আনন্দ। যেন তিনি স্বর্গের সুধা পেয়েছেন। তাঁর চলার মধ্যে সেই ভাব ও ভঙ্গী।

ভক্তটিকে মা জিজ্ঞেস করলেন, আর কি ফল ছিল না?

ভক্ত বলল, না মা।

মা বললেন, খুঁজে দেখ, আরও আছে।

ভক্তটি তখন বাধ্য হয়ে আবার খুঁজতে গেল। গিয়ে দেখল, আরও একটি আম সেখানে রয়েছে। সেটি এনে সে মাকে দিল।

মা বললেন, এটাও সন্ন্যাসীকে দিয়ে এসো।

তখন আম নিয়ে ছুটতে লাগল সন্ন্যাসীকে দেবার জন্য। সন্ন্যাসী তখন কিছুটা দূর এগিয়ে গেছে। ভক্ত তাঁর কাছে গিয়ে বলল, এই নিন, মা আর একটা ফল আপনাকে দিয়েছেন।

সন্ন্যাসী সেই ফল পেয়ে রাস্তার মাঝখানেই নাচতে লাগলেন।

কি ভাগ্য তাঁর। মা প্রথমে তাঁকে দিয়েছেন তিনটি ফল—ধর্ম, অর্থ আর কাম। আর শেষে দিলেন শেষ ফল—মোক্ষ।

মানুষ যখনই অহংকার মুক্ত হতে পারবে, নিজের সব কিছু ত্যাগ করতে পারবে, তখনই সে পাবে মোক্ষফল। সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন, মা তাঁকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন।

একবার বিষ্ণুপুর স্টেশনে মা বসে আছেন। গাড়ি আসার অনেক দেরি আছে। তাই তাঁকে অনেকক্ষণ বসতে হল।

এমন সময় কোত্থেকে এক হিন্দুস্থানী কুলী ছুটতে ছুটতে মার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

মা অবাক্। তাঁর সঙ্গীরা সন্ত্রস্ত।

কুলীটা অঝোর ধারে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমিই আমার মা জানকী! তোমাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। বহুদিন থেকে তোমাকে খুঁজছি। তুমি আমাকে দয়া কর মা!

কুলীটা কিছুতেই মায়ের পা ছাড়তে চায় না!

মা তাকে বললেন, তুই একটা ফুল নিয়ে আয় বাছা।

কুলী ছুটে গিয়ে কোত্থেকে একটা ফুল নিয়ে এল। মা সেখানে বসেই তাকে মন্ত্র দিলেন।

মন্ত্র পেয়ে যেন ধন্য হয়ে গেল কুলী। মানবজন্ম যেন সার্থক হয়ে গেল তার। মাকে প্রণাম করে সে বিদায় নিল।

একজন ভক্ত আবার এসে মাকে বলল, মা, এত জপতপ করলাম কিছুই তো হল না।

মা বললেন, একি শাক মাছ বাবা, যে গিয়ে অমনি নগদ পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে আসবে। বিশ্বাস রাখো, ধৈর্য ধরো, তা হলেই পাবে। চন্দন ঘষতে ঘষতে তবে তার গন্ধ বার হয়। ঠাকুরের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা করো।

ভোরবেলা উঠে মা যান এ বাড়ি ও বাড়ি। কোন ভক্ত হয়তো

অসুখে পড়েছে, তার জন্য একটু দুধ দরকার। কারুর জন্য দরকার মিছরি বার্লি। সবার জন্যই মার চিন্তা। দুধ, ফল, ডাব যা পান নিয়ে আসেন গরিব ভক্তদের জন্য। তাদের বিলিয়ে দেন।

ভক্তের সংখ্যা দিন দিন যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে শিষ্যের সংখ্যা।

রাধুর স্বামী মন্মথ, সেও একদিন এসে মার কাছে বলল, আমাকে মন্ত্র দাও।

মা বললেন, তোমাকে মেয়ে দিয়েছি, আবার মন্ত্র দিই কি করে? কুলগুরু তা হলে চটে যাবেন যে। আর কুলগুরু চটলে আমার মেয়েরই অকল্যাণ হবে।

কিন্তু মন্মথ কোন কথা শুনতে রাজী হয় না। সে মন্ত্র চায়। বলল, শুধু মেয়ে নিয়ে ভুলব, এমন বোকা আমি নই।

মা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, রাধুর কোষ্ঠীতে বৈধব্য-যোগ আছে। মন্ত্র দিলে ঠাকুরের কৃপায় যদি সেই ফাঁড়া কাটা যায়।

অনেক ভেবে মা মন্মথকে মন্ত্র দিলেন।

মা তখন বাতের অসুখে ভুগছেন।

শিরোমণিপুর থেকে একজন স্ত্রীলোক একদিন এসে হাজির হল মায়ের কাছে। মাথার চুল উসকো খুসকো, মলিন বসন। তার ছেলের অসুখ, অনেক চিকিৎসা করেও কোনও ফল হয় নি। এখন সে মৃত্যুশয্যায়।

কে যেন তাকে বলেছে মায়ের পাদোদক খেলেই ছেলে ভাল হয়ে যাবে। তাই সে ছুটে এসেছে। পাত্রে করে নিয়ে এসেছে জল।

মা সে কথা শুনে জলের পাত্রে পায়ের আঙুল ডোবাতে গেলেন। এমন সময় এক ভক্ত ছুটে এসে বাধা দিল। বলল, না, মায়ের পাদোদক পাবে না। হয় ছেলের ভাল করে চিকিৎসা করাও আর না হয় অন্য কারুর কাছ থেকে পাদোদক নাও।

স্ত্রীলোকটি হতাশ হয়ে মুখ মলিন করে দাঁড়িয়ে রইল।

আর একজন ভক্তও এসে বাধা দিল এই সময়। বলল, একে তুমি

বাতে ভুগছো, তার ওপর আবার কি অসুখ হয় ঠিক নেই। তুমি পাদোদক দিও না।

স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ের খুব দুঃখ হল। তিনি কাছে ডেকে খুব আস্তে আস্তে বললেন, তুই চুপি চুপি এলি না কেন? তা হলে পেয়ে যেতিস। যা হোক, গাঁয়ে তো অনেক বামুন আছে তাদের কারুর কাছ থেকে নিয়ে নে। ভয় নেই, আমি বলছি তোর ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

স্ত্রীলোকটি মায়ের আশ্বাস পেয়ে মনে সান্ত্বনা নিয়ে চলে গেল।

একবার এক বৃদ্ধ এসে বললে, আমাকে মন্ত্র দাও।

মা বললেন, তা এখানে কেন?

বৃদ্ধ বলল, শুনেছিলাম রামকৃষ্ণ নামে একজন মস্ত বড় সাধু ছিলেন, তাঁকে তো আর দেখতে পেলাম না। শুনলাম তাঁর স্ত্রী নাকি তাঁর কাছ থেকে কিছু শক্তি পেয়েছেন। তাই তোমার কাছে এলাম।

মা অবাক্ হলেন। লোকটা বলে কি? ঠাকুর কি শুধু সাধু ছিলেন? তিনি যে স্বয়ং ঠাকুর।

যোগেন-মার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, ও যোগেন, এ বলে কি শুনছ? এ যে ঠাকুরকে চেনে না। কি করি বল তো?

যোগেন-মা বললেন, ওকে মন্ত্র দাও। তোমার মন্ত্রের বল কত তা দেখুন। তা হলেই ঠাকুরকে চিনতে পারবে।

মা বৃদ্ধকে মন্ত্র দিলেন। বৃদ্ধ চিনতে পারল মাকে—ঠাকুর রামকৃষ্ণকেও।

কোয়ালপাড়ায় এসে মায়ের জ্বর হল।

দু তিন দিন পর। সেদিন জ্বর নেই। শরীর দুর্বল। দুপুরবেলা মা বারান্দায় বসে আছেন। পাশে নলিনী বসে কাপড় সেলাই করছে।

হঠাৎ মা দেখলেন, সদর দরজা দিয়ে ঠাকুর এসে ঢুকলেন বাড়িতে। তাঁর কাছেই এসে বসে পড়লেন।

তখন দুপুর বেলা। প্রচণ্ড গরম। ঠাকুরকে দেখে মনে হল তিনি যেন পরিশ্রান্ত। তাই বুঝি ঠাণ্ডা পেয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়লেন।

মা অমনি নিজের শাড়ির আঁচল পেতে দিতে গেলেন ঠাকুরকে। কিন্তু কি হতে কি হয়ে গেল, মা নিজেই পড়ে গেলেন। নলিনী চেঁচিয়ে উঠল। লোকজন ছুটে এসে মার চোখে জল দিতে লাগল। জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে মা?

মা বললেন, না, কিছু হয় নি। ছুঁচে সুতো পরাতে গিয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

আসল কথাটা মা কাউকে বললেন না।

ভক্তের কাছে যেমন ভগবান বাঁধা থাকেন, তেমনি যেন মায়ের কাছে বাঁধা আছেন ঠাকুর। তাই তো ঠাকুর তিরোধানের পরও মাকে বলেছিলেন, আমি কি কোথাও গেছি? এই যেন এ ঘর থেকে ও ঘর।

সত্যি, ঠাকুর যে চিরজাগ্রত, অমর।

॥ ২৭ ॥

শ্রীমার শেষ জীবনের কয়েক বছর কেটেছে নিবিড় কর্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে। তার করুণারাশি তখন মন্দাকিনীর ধারার মত বয়ে চলেছে।

ভক্তসংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। কৃপাপ্রার্থীরা আসছে দলে দলে। মার শারীরিক ও মানসিক কাজের এবং চিন্তার বিরাম নেই। তিনি চলেছেন কলের ইঞ্জিনের মত অবিরাম। রাত্রেও নিদ্রা নেই চোখে। দৈনন্দিন কাজের পর ভক্ত সন্তানদের মঙ্গলের জন্য জপ-ধ্যান করে সারা সময় কাটান।

বয়সের অনুপাতে দেহ ক্ষীণ, আবার সর্বপ্রকার কাজের চাপে সকল সময়ে দেহ ও মন নিরত। তার ওপর ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী বার বার আক্রমণ করতে লাগল মায়ের ওপর। মা অতিমাত্রায় জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়লেন। তার ওপর একে একে ভক্তদের ও আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুশোক পর পর তাঁর দেহ ও মনের ওপর প্রবল আঘাত হানতে লাগল।

১৩২৪ সাল, পৌষ মাস।

মার জ্বর হল। অবিরাম জ্বর। সেই জ্বর বেড়ে বেড়ে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

সংবাদ পেয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য ডাক্তার কাঞ্জিলাল এবং আরও কয়েকজন কলকাতা থেকে এলেন জয়রামবাটি। তাঁদের অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষায় সেবায় মা সুস্থ হলেন।

তার কিছুদিন পর কোয়ালপাড়ার সেই উৎকট জ্বর আবার মাকে ধরল। তিনি জ্বরের ঘোরে কেবল শরৎ মহারাজের নামই বারবার করতেন। সেই ডাক বুঝি সারদানন্দের কানে গিয়ে পৌঁছাল। তিনি

ডাক্তার কাঞ্জিলালকে পাঠিয়ে দিয়ে পরে নিজেও চলে গেলেন জয়রামবাটি।

কি আশ্চর্য! স্বামিজী পৌঁছবার পরদিনই মায়ের জ্বর ছেড়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন মা। কিন্তু আগেকার স্বাস্থ্য আর ফিরে এল না।

একদিন এক অপরিচিত লোক এল মাকে দেখতে। অনেক দূর থেকে সে এসেছে। মাকে দেখার পর তার মনে প্রবল বাসনা জাগল, মায়ের কাছে সে দীক্ষা নেবে।

কিন্তু মায়ের তখন ওঠা এবং চলাফেরা করা বারণ। তাই ভক্তরা মায়ের কাছে সেই প্রস্তাব করতে রাজী হল না। কিন্তু মায়ের কানে সে কথা যেতেই তিনি উঠে বসলেন। বললেন, এসো, তোমাকে আমি দীক্ষা দেব।

অসুস্থ শরীর নিয়ে মা দীক্ষা দিলেন সেই অপরিচিত লোকটিকে। কারুর মনস্কামনা মা অপূর্ণ রাখতে চান না।

১৩২৬ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ।

ঐ দিন মায়ের অনুরাগী ব্যক্তি ও ভক্তরা শ্রীমার জন্মতিথি পালন করার সিদ্ধান্ত করলেন।

মায়ের শেষ জন্মতিথি।

মায়ের দেহ রোগে জীর্ণশীর্ণ। ভক্ত আর সন্তানের দল সব ছুটে এলেন জয়রামবাটিতে।

মায়ের সেবক সারদানন্দের নিবেদিত শাড়িখানা মা পরলেন। ভক্ত মেয়েরা সীমন্তে পরিয়ে দিল সিন্দুরবিন্দু আর চন্দন তিলক। গলায় পরিয়ে দিল ফুলের মালা।

মায়ের সেদিন কি এক অপরূপ মূর্তি!

কিন্তু সেদিন থেকেই মার শরীর আবার খারাপ হতে লাগল। আরম্ভ হল জ্বর। জ্বর কখনো ছাড়ে, আবার কখনো বাড়ে। ভুগতে ভুগতে দেহ একেবারে অক্ষম হয়ে পড়ল।

সারদানন্দ খবর পেয়ে মাকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি—সব রকমের চিকিৎসাই করান হল। রোগের কোন উপশম দেখা দিল না।

একদিন মা কলঘরে যাবেন। পাশেই একটি ভক্ত-মেয়ে ছিল, তাকে বললেন, হাতটা একটু ধর তো মা, উঠি।

মেয়েটি হাত ধরল। মা উঠলেন বিছানা থেকে। চলতে ফিরতে একটু কষ্ট হয়। ভক্তরা উঠতে বারণ করে। তবু মা ওঠেন। বলেন, যতদিন চলবার ক্ষমতা আছে ততদিন চলবো।

অনেকটা এগিয়ে এসেছেন মা। সহসা দেখলেন দরজার পাশে একটা লাঠি। মা খুশী হয়ে বললেন, এই ছ্যাখো গো, কে একগাছা লাঠি রেখে গেছে।

অনেকদিন থেকে মা মনে মনে ভাবছিলেন, একটা লাঠি পাই তো ভর করে একটু হাঁটতে-চলতে পারি। পায়ের ওপর ভর করে চলতে আর ভাল লাগে না।

মার মনের কথা জানতে পেরে ঠাকুর ঠিক লাঠি যুগিয়ে দিয়েছেন। নইলে এমন সময়ে লাঠি আসবে কোত্থেকে? কেউ আনে নি, কাউকে ফেলে যেতেও কেউ দেখে নি।

মা সেই লাঠিতে ভর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলতে লাগলেন।

কিন্তু দিন যত যায় মায়ের খাওয়াও কমে যায়। খিদে নেই, রুচি নেই। মায়ের সেবিকারা কত অনুরোধ করে মাকে, মা খেতে চান না।

ভক্তদের চোখের সামনে নিরাশার অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে আসতে লাগল।

দৈব চিকিৎসা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন সব কিছুর আয়োজন করল ভক্তেরা। যদি মার অবস্থার পরিবর্তন হয়।

এক বছর আগে দেহত্যাগ করেছেন স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ। সেই শোক মা এখনো ভুলতে পারেন নি। এমন সময় আবার খবর এল দক্ষিণেশ্বরের প্রিয় সেবক অদ্ভুতানন্দ কাশীধামে মহাসমাধি

লাভ করেছেন। তাঁরই মন্ত্রশিষ্য রামকৃষ্ণ বসুর লোকান্তর, ছোট ভাই বরদাপ্রসন্নের দেহান্তর মাকে একেবারে শোকজর্জর করে তুলল।

শ্রীমা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর জীবনের দিন আর বেশী বাকী নাই। ক্রমশঃ তিনি সমস্ত মায়িক অবলম্বন ছিন্ন করতে লাগলেন। রাধুর মায়াও তিনি কাটালেন।

রাধুকে বললেন, তুই জয়রামবাটিতে চলে যা। তোর ছেলেকেও নিয়ে যা সঙ্গে।

যোগেন-মা, শরৎ মহারাজ এবং আরও অনেকে বললেন, সে কি, রাধুকে ছাড়া আপনি থাকবেন কেমন করে ?

মা বললেন, খুব থাকতে পারবো। ওদের ওপর থেকে আমি মন তুলে নিয়েছি। তা ছাড়া রাধু আর ওর ছেলে তো এরপর জয়রামবাটিতেই থাকবে।

ভক্তরা ভাবতে লাগল, মা এমন করে মন তুলে নিচ্ছেন, হয় তো তাঁকে আর বেশীদিন ধরে রাখা যাবে না।

মা বললেন, রাধু আমার কেউ নয়, ওর ছেলে আমার কেউ নয়।

রাধুর কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছা নেই। তার চেয়েও বেশী অনিচ্ছা ওর ছেলের। মার ঘর থেকে সে যেতেই চায় না।

একদিন মা ঘুমুচ্ছেন। ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকিয়েই দেখলেন, রাধুর ছেলে তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একটু বিরক্তভাবেই বললেন, ওরে চলে যা। এদিকে আর এগোসনি।

রাধু ঘরে ঢুকে মায়ের একথা শুনে কেঁদে ফেলল। ছেলেও কাঁদল।

স্বামী সারদানন্দকে ডেকে এনে সমস্ত বিষয়-কর্ম বুঝিয়ে দিলেন। ভক্ত সন্তানদের যাতে কষ্ট না হয়, তিনি তার নির্দেশ দিলেন।

ভক্তদের চোখ ছলছল করে উঠল। তা হলে কি মা সত্যি চলে যাচ্ছেন তাদের ছেড়ে ? একথা যে কল্পনাও করা যায় না।

প্রৌঢ়া এক ভক্ত গৃহিণী এল মাকে দেখতে। ঘরে তখন কারুর ঢোকার অনুমতি নেই। তাই দরজার বাইরে বসে পড়ল। সেদিকে

মার চোখ পড়তেই মা তাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। বললেন, বসো।

কিন্তু প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি বসবে কি, মায়ের জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখে কেঁদেই ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা, তুমি যখন থাকবে না তখন আমাদের কি দশা হবে?

মা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, কোন ভয় নেই। একটি কথা শুধু বলে যাই, যদি শান্তি চাও, অন্যের দোষ দেখো না। শুধু নিজের দোষ দেখো। কেউ তোমার পর নয়, সব তোমার আপনার লোক। সবাইকে আপনার করো।

কি অদ্ভুত মায়ের সেই বাণী!

ভক্তরা মাকে আঁকড়ে রাখতে চায়। তাই তাদের চেষ্টার বিরাম নেই। দৈব্য-চিকিৎসা অনেক করা হল। পঞ্চ মহাবিদ্যার অর্চনা, পাঁচটি গ্রহ পূজাও করা হল। শত চণ্ডীপাঠ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কত কিছু করা হল, অথচ কোন কিছুতেই ফল হল না।

দেখতে দেখতে এগিয়ে এল মহাকাল।

সকলের আপ্রাণ চেষ্টা, সর্বপ্রকার চিকিৎসা, ভক্তসন্তানদের আকুল-ক্রন্দন সব কিছু ব্যর্থ করে মা চলে গেলেন।

সেদিন ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ।

মার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় তাঁর প্রিয় সেবকসন্তান শরৎ মহারাজ তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখে অশ্রুধারা।

মা শরৎ-মহারাজকে বললেন, শরৎ এরা সব রইল, তুমি এদের দেখো।

রাত দেড়টার সময় মা মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। জীবনদীপ নির্বাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালো ও কুঞ্চিত হয়ে গেল মার সারা দেহ।

কিন্তু কি আশ্চর্য! পরদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তাঁর দেহে অপূর্ব দিব্য জ্যোতি। মুখের ফোলা কমে গেল আর মুখমণ্ডলে এল এক রক্তিম লাবণ্য। প্রতিমার মুখে যেমন লাবণ্য থাকে ঠিক তেমনি।

যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের ছিল পরম সৌভাগ্য। তারা নয়ন ভরে দেখল শারদীয়ার সেই ভগবতীর মূর্তি।

সকালবেলা শোভাযাত্রা করে মায়ের দেহ নিয়ে যাওয়া হল বেলুড় মঠে। তার আগে মার শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে স্নান করানো হল গঙ্গায়। শোভাযাত্রার বাহক সারদানন্দ, শিবানন্দ, মাস্টারমশাই আরো অগণিত ভক্তসন্তান।

বেলুড় মঠের নির্ধারিত স্থানে মার জন্য চিতাশয্যা রচনা করা হল। বেলা প্রায় দুটোর সময় জ্বলল প্রথম অগ্নিশিখা।

কোন ভক্ত ঠাকুরের প্রত্যক্ষদর্শন না পেয়ে দুঃখ করেছিলেন। মা তখন নিজের দেহ দেখিয়ে বলেছিলেন, এই দেহের ভিতর তিনিও সূক্ষ্মদেহে আছেন।

শ্রীমা নিজের মুখে বলেছেন—পূর্ব পূর্ব অবতারে তিনি এসেছিলেন। একশত বৎসর ভক্তদের অন্তরে থেকে ঠাকুর নবকলেবর ধারণ করে আবার এই পৃথিবীতে আসবেন। আর শ্রীমা হবেন তাঁর লীলা-সঙ্গিনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার যারা অনুরাগী তারা আজও বুঝি ব্যাকুলভাবে সেই দিনের প্রতীক্ষা করছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাণী

ঠাকুর বলতেন, 'হরিণের নাভিতে যখন কস্তুরী হয়, তখন তার· গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোথা হতে গন্ধটি আসছে।' তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে।

যদি ঈশ্বরে আশ্রয় নাও তিনিই রক্ষা করবেন। চিন্তা যখন কু বলে বুঝতে পারছ, তখন আর ভাবনা নেই। যে ভালো হতে চায় তাকে যদি ঈশ্বর রক্ষা না করেন তবে সে পাপ ঈশ্বরের।

সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে। আমি যখন আগে জয়রামবাটি ছিলুম, দিনরাত কাজ করতুম।

গুরুভক্তি থাকা চাই। গুরু যেমনই হোন, তাঁর প্রতি ভক্তিতেই মুক্তি। ঠাকুরের শিষ্য ভক্তদের কি ভক্তি দেখ দেখি। এই গুরুভক্তির জন্য ওরা গুরুবংশের সকলকে ভক্তি তো করেই, গুরুর দেশের বিড়ালটাকে পর্যন্ত মান্য করে।

সেই আদিকাল হতে কত লোকে মূর্তি-উপাসনা করে মুক্তি পেয়ে আসছে, সেটা কিছু নয়?—ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান—সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জনে এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রঙের পাখি এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও

সকলগুলিকেই আমরা পাখির বোল বলি—একটাই পাখির বোল আর অন্যগুলো পাখির বোল নয় এরূপ বলি না।

ঠাকুর বলতেন, জরু, গরু, ধান—এ তিন রাখবে আপন বিদ্যমান।

বিধাতা যখন প্রথম মানুষ সৃষ্টি করলেন, তখন এক প্রকার সত্ত্বগুণী করেই করলেন। ফলে তারা জ্ঞান নিয়ে জন্মাল, সংসারটা যে অনিত্য তা বুঝতে আর তাদের দেরি হল না। সুতরাং তখনি তারা সব ভগবানের নাম নিয়ে তপস্যা করতে বেরিয়ে পড়ল এবং তাঁর মুক্তিপদে লীন হয়ে গেল। বিধাতা দেখলেন, তবে তো হল না। এদের দিয়ে তো সংসারে লীলা-খেলা কিছু করা চলল না। তখন সত্ত্বের সঙ্গে রজতম অধিক করে মিশিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। এবার লীলা-খেলা চলল ভাল।

দর্শন কি রোজই হয়? ঠাকুর বলতেন, 'ছিপ ফেলে বসলেই কি রোজই রুই মাছ পড়ে? অনেক মাল-মসলা নিয়ে একাগ্র হয়ে বসলে কোনদিন বা একটা রুই এসে পড়লো, কোনদিন বা নাই পড়লো, তাই বলে বসা ছেড়ো না'। জপ বাড়িয়ে দাও।

সর্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব।' যে যা-খুশি কর না কেন, যে যে-ভাবে খুশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষ কালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা তো ছুড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই।

সংসারীদের মতে একটা কথা আছে যে অকালে তীর্থদর্শন করে না। দেখ, কালাকালের অপেক্ষা করে পুণ্যকর্ম স্থগিত রাখা যায়;

কিন্তু কালের (মৃত্যুর) নিকট কালাকালের বিচার নাই। মৃত্যুর যখন অবধারিত কাল নেই তখন সুযোগ উপস্থিত হলেই কালাকালের অপেক্ষা না করে পুণ্যকার্য করে ফেলা ভাল।

তোমরা সর্বদা জেনো—তোমাদের পেছনে একজন রয়েছেন।

ঠাকুর কি তোমাদের ভাল মন্দ দেখছেন না? অত ভাবো কেন? তোমাদের যে তাঁর পায়ে সঁপে দিয়েছি। একটা গণ্ডীর মধ্যে তোমাদের ঘুরতে হবেই অন্য কোথাও যাবার জো নেই। তিনি সর্বদা তোমাদের রক্ষা করছেন।

সর্বদা মনে ভাববে আমি কার সন্তান, কার আশ্রিত। যখনি মনে কোন কুভাব আসবে, মনকে বলবে—তাঁর ছেলে হয়ে আমি কি এ কাজ করতে পারি? দেখবে—মনে বল পাবে, শান্তি পাবে।

স্বার্থ। যতক্ষণ মুঠো করে ততক্ষণ আপনার, তারপর আর নয়।

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়। হিংসা, খলতা, ব্রহ্মহত্যা—এই সব পাপ; রাজার পাপে প্রজার কষ্ট ও দৈব-উৎপাত—যেমন যুদ্ধ, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ। সবাই একটু নরম হলে তো যুদ্ধ থেমে যায়।

ভগবান লাভ হলে কি আর হয়, দুটো শিং বেরোয়? না, মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনে জ্ঞান, চৈতন্য, আনন্দ লাভ হয়। আর ভগবানে ভক্তি ভালবাসা, অনুরাগ বাড়ে। সর্বদা একটা টান থাকে।

মন মত্ত করী, হাওয়ার সঙ্গে ছোটে। তাই সর্বদা বিচার করতে হয়। ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টা করা দরকার।

মনের গোলযোগ—ওটা প্রকৃতির নিয়ম। যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা

আছে, তেমনি মন কখনও ভাল, আবার কখনও মন্দ থাকে। যখনই যা কিছু খাবে, তাঁকে নিবেদন করে প্রসাদরূপে খাবে। তাহলে রক্ত শুদ্ধ হবে, মন শুদ্ধ হবে।

মনেতেই সব; মনেতেই শুদ্ধ, মনেতেই অশুদ্ধ। মানুষের নিজের মনটি আগে দোষ করে, তবে সে পরের দোষ দেখে। পরের দোষ দেখলে কার কি হয়? নিজেরই ক্ষতি। আমার এটি ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস ছিল—কারু দোষ দেখতে পারতুম না, ওটি শিখি নাই।

মন্ত্রের দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়; মন্ত্র জপ করে মানুষ পবিত্র হয়। জপাৎ সিদ্ধি! জপাৎ সিদ্ধি।

রোজ পনেরো বিশ হাজার জপ করতে পারে তাহলে হয়, আমি দেখেছি বাস্তবিক হয়। আগে করুক, তারপর না হয়, তখন বলবে। তবে একটু মন দিয়ে করতে হয়। কেউ কিছু করবে না, কেবল বলবে, কেন হয় না?

ধ্যান জপের একটা সময় থাকা খুব দরকার। সন্ধির সময় তাঁকে ডাকা উচিত। রাত যাচ্ছে, দিন আসছে, আবার দিন যাচ্ছে, রাত আসছে—এই হল সন্ধি। এমন সময় মন শান্ত পবিত্র থাকে। অসুখ করলে বা কাজের ঝঞ্ঝাটে স্মরণ, প্রণাম করলেও হয়।

জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়, কিন্তু ভগবানকে প্রেম-ভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না। জপতপ কি জানো? ওর দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলো কেটে যায়। রাখালেরা কি কৃষ্ণকে জপধ্যান করে পেয়েছিল? না; তারা আয় রে, খা রে, নে রে—এই করে পেয়েছিল?

যার (অর্থ) আছে সে মাপো (দান কর), যার নেই সে জপো।

শরীর ধারণে কিছুমাত্র সুখ নাই। দুঃখপূর্ণই জগৎ; কেবল সুখ একটি—তাঁর নামে। তাঁর কৃপা যার ওপর হয়েছে, সেই কেবল তাঁকে জানতে পেরেছে, এবং সেইটুকুই তার সুখ।

মানুষকে ভালবাসলে দুঃখকষ্ট, মনের বাজে খরচ হয়। ভগবানকে ভালবাসতে পারলে তবেই শান্তি।

কাজ করতেই হয়। কর্মেই কর্মপাশ কাটে। কাজ ছাড়া থাকা ঠিক নয়।

কর্মফল কেউ এড়াতে পারে না। তবে যদি সাধন ভজন থাকে, যেখানে খাঁড়ার ঘা লাগার কথা, সেখানে কাঁটাটি ফোটে।

বাসনা থেকেই শরীর। যখন বাসনা থাকে না তখন শরীর পড়ে যায়। সম্পূর্ণ বাসনাক্ষয়ই মুক্তি। নির্বাসনা হবার বাসনা কর।

দুঃখ-বিপদ আসবে না মনে করা অন্যায়। তারা আসবেই। তবে ভক্তের কি হয় জানো? পায়ের তলা দিয়ে জলের মত বেরিয়ে যায়।

সাধন বল, ভজন বল, প্রথম বয়সেই করে নেবে। শেষে কি আর হয়? যা করতে পার, এখন।

ঠাকুর বলতেন, 'যারা আমাকে ডাকবে তাদের জন্য আমাকে অন্তিমে দাঁড়াতে হবে।' এটি তাঁর নিজের মুখের কথা।

যারা একাধারে স্বামী, অন্যধারে ছেলে নিয়ে সংসারে তাদের সেবা করেও তাঁকে ডাকতে পারে, তারা নিশ্চয়ই তাঁর দেখা পাবে।

সর্বদা ইষ্টচিন্তা থাকলে অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে?

আমার ছেলে যদি ধুলো কাদা মাখে, আমাকেই তো তা ধুয়ে মুছে তাকে কোলে তুলে নিতে হবে।

ঝড় যেমন মেঘ উড়িয়ে নেয় তেমনি তাঁর নামে বিষয় মেঘও উড়ে যাবে।

কাম কি একেবারে যায়? দেহ থাকলেই কিছু না কিছু থাকে। তবে কি জানো? সাপের মাথায় ধুলোপড়া পড়লে যেমনটি হয় তেমনটি হয়ে যাবে।

ঠাকুর বলতেন—'সাধু সাবধান।' সাধুর সর্বদা সাবধানে থাকতে হয়। সাধু সর্বদা সাবধানে থাকবে। সাধুর রাস্তা বড় পিছল। পিছল পথে চলতে হলে সর্বদা পা টিপে চলতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা? সাধু মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না। চলবার সময় পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে লক্ষ্য রেখে চলবে। সাধুর গেরুয়া কাপড় কুকুরের বগলসের মত তাকে রক্ষা করবে। কেউ তাকে মারতে পারবে না। সাধুর সদর রাস্তা। সকলেই তার পথ ছেড়ে দেয়।

দয়া যার শরীরে নেই, সে কি মানুষ? সে তো পশু। আমি কখনও কখনও দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই, ভুলে যাই যে আমি কে।

চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে চোখটি, মুখটি, নাকটি—এমনি একটু একটু করে পুতুলটি তৈরি করে, ভগবান কি এমনি একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন? না, তাঁর একটা শক্তি আছে। তাঁর 'হাঁ' তে জগতের সব হচ্ছে, 'না' তে লোপ পাচ্ছে। যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয়নি।

ভগবানকে কে বাঁধতে পেরেছে বল না। তিনি নিজে ধরা

দিয়েছিলেন বলে তো যশোদা তাঁকে বাঁধতে পেরেছিল, গোপ গোপীরা তাঁকে পেয়েছিল।

বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না, বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়। একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়। তাই তো মঠে এত জিনিস আসে। বাসনাটি সূক্ষ্ম বীজ—যেমন বিন্দু পরিমাণ বট বীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনই। বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই, যেন এক খোল থেকে নিয়ে আর এক খোলে ঢুকিয়ে দিলে। একেবারে বাসনাশূন্য হয় দু-একটি। তবে বাসনায় দেহান্তর হলেও পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকলে চৈতন্য একেবারে হারায় না।

মানুষ এই আছে, এই নাই। কিছুই সঙ্গে যাবে না। একমাত্র ধর্মাধর্মই সঙ্গে যাবে। পাপ-পুণ্য মৃত্যুর পরও সঙ্গে যায়।

ভগবানের ওপর নির্ভর করে বিশ্বাস করে যে পড়ে থাকে, এইটিই তাদের সাধন। আহা, নরেন বলেছিল, লাখ জন্ম হলেই বা তাতে ভয় কি? তাদের তো আর পাপ হয় না। অজ্ঞানীরই যত ভয়। তারাই বদ্ধ হয়, পাপে লিপ্ত হয়। কত লাখ লাখ জন্ম ভুগে ভুগে, যাতনা পেয়ে পেয়ে শেষে ভগবানকে চায়।

জপ, সংখ্যা, করগণনা এসব শুধু মন আনবার জন্য। মন এদিক ওদিক যেতে চায়, তবু ঐ সবের দ্বারা একদিকে আকৃষ্ট হয়। যখন জপ করতে করতে ভগবানের রূপ-দর্শন হয়, ধ্যান হয়, তখন জপও থাকে না। ধ্যান হল তো সবই হল।

মন চঞ্চল, তাই প্রথম প্রথম মন স্থির করবার জন্য একটু একটু নিঃশ্বাস বন্ধ করে ধ্যানের চেষ্টা করতে হয়। তাতে মন স্থির হবার সাহায্য করে। কিন্তু ওভাবে বেশী করতে নাই, মাথা গরম হয়। ভগবান দর্শন বল, ধ্যান বল, সবই মন। মন স্থির হলে সবই হয়।

মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ। তিনি শতবর্ষ ছেলেপুলে নিয়ে থাকবেন বলেছেন।

মায়ের মুখের গল্প

মা বললেন—সৃষ্টিই সুখদুঃখময়। দুঃখ না থাকলে সুখ কি বোঝা যায়? আর সকলের সুখ হওয়া সম্ভব কি করে? সীতা বলেছিলেন রামকে, 'তুমি সকলের দুঃখকষ্ট দূর করে দাও না কেন? রাজ্যে যত প্রজা লোকজন আছে সকলকে সুখে রাখ। তুমি তো ইচ্ছা করলেই পার।'

রাম বললেন, 'সকলের সুখ একসঙ্গে কি হয়?'

সীতা বললেন, 'না, তুমি ইচ্ছা করলেই হয়, যার যা অভাব হয় রাজভাণ্ডার হতে দিয়ে দাও।'

রাম বললেন, 'আচ্ছা, তোমার কথামতই হবে।'

রাম তখন লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন, 'যাও, রাজ্যের সকলকে জানাও, যার যা অভাব থাকে চাইলেই রাজকোষ থেকে পাবে।' খবর পেয়ে সকলে এসে দুঃখ জানালে। রাজকোষ থেকে টাকা দেওয়া হল। তখন সকলে বেশ সুখে দিন কাটাতে লাগল।

রাম সীতা যে অট্টালিকায় থাকতেন তার ছাদ ফেটে জল পড়তে আরম্ভ হল। রাম তা মেরামত করবার জন্য লোকজন ডাকতে পাঠালেন। কিন্তু কোথায় লোকজন? কুলী-মজুর কি আর আছে? টাকার কারুর অভাব নেই, কাজেই কাজকর্ম কেউ করে না। প্রজারা এসে জানালে—কুলী-মজুরের অভাবে প্রজাদের ঘর দরজা, কাজকর্ম সব নষ্ট হতে চলেছে।

তখন নিরুপায় হয়ে সীতা রামকে বললেন, 'আর ভিজে ভিজে কষ্ট সহ্য হয় না, যেমনটি ছিল তুমি তেমনটি করে দাও, তা হলে কুলী-মজুর সব মিলবে। সকলের একসঙ্গে সুখ হওয়া সম্ভব নয়।'

রাম বললেন, 'তথাস্তু।'

তখন দেখতে দেখতে সব পূর্বের মত হল। কুলী মজুর মিস্ত্রী সব মিলল। সীতা বললেন, 'ঠাকুর, এ সৃষ্টি তোমারই অদ্ভুত খেলা।'

গল্পটি শেষ করে মা বললেন, 'চিরদিন কেউ দুঃখী থাকবে না, সব জন্ম কারও দুঃখে যাবে না। যেমন কর্ম, তেমন ফল, তেমন যোগাযোগ হয়।

ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত তেজচন্দ্র মিত্র মারা যাবার পর এক ভক্তের সঙ্গে জননী সারদা দেবীর সেই সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। মা বললেন, যে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে সেই তাঁর দেখা পাবে। এই তো সেদিন ছেলেটি মারা গেল। আহা, সে কত ভাল ছিল। ঠাকুর তাদের বাড়ি যেতেন।

একদিন পরের গচ্ছিত দুশো টাকা গাড়িতে তার পকেট থেকে মারা যায়, বাড়ি এসে দেখে। ব্যাকুল হয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে কাঁদছে— 'হায় ঠাকুর, কি করলে!' তার অবস্থাও তেমন নয় যে নিজে ঐ টাকা শোধ করবে।

কাঁদতে কাঁদতে দেখে ঠাকুর তার সামনে এসে বলছেন, 'কাঁদছিস কেন? ঐ গঙ্গার ধারে ইট চাপা আছে ছাখ্।'

সে তাড়াতাড়ি উঠে ইটখানা তুলে দেখে—সত্যই এক তাড়া নোট। সে শরতের কাছে এসে সব বললে। শরৎ শুনে বললে, 'তোরা তো এখনো দেখা পাস, আমরা কিন্তু আর পাই নে।'

মা সব শেষে বললেন, ওরা পাবে কি? ওরা তো দেখে শুনে এখন গ্যাঁট হয়ে বসেছে। যারা ঠাকুরকে দেখেনি, এখন তাদেরই ব্যাকুলতা বেশী।

একদিন এক ভক্ত মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তোমাকে কখন কখন রামায়ণ পড়তে দেখি। পড়তে কবে শিখলে?'

মা বললেন, ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ ওরা সব পাঠশালা যেত। ওদের সঙ্গে কখন কখন যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম। পরে কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম।

ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে। বললে, মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই, শেষে কি নাটক, নভেল পড়বে? লক্ষ্মী তার বই ছাড়বে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত। সে এসে আবার আমায় পড়াত। ভাল করে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে। একাটি একাটি আছি। ভব মুখুয্যেদের একটি মেয়ে আসত নাইতে। সে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। সে রোজ নাইবার সময় পাঠ দিত ও নিত। আমি তাকে শাকপাতা, বাগান হতে যা আমার এখানে দিত, তাই খুব করে দিতুম।

মা পুরানো দিনের গল্প করছেন।

মা বললেন, ঠাকুর যখন পেটের অসুখ করে কামারপুকুরে গিয়েছিলেন, আমি তখন ছেলেমানুষ বউটি ছিলুম। ঠাকুর একটু রাত থাকতেই উঠে আমাকে বলতেন, 'কাল এই এই সব রান্না করো গো।'

আমরা তাই রান্না করতুম। একদিন পাঁচ ফোড়ন ছিল না, দিদি (লক্ষ্মীর মা) বললে, তা অমনিই হোক, নেই তার কি হবে?

ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে ডেকে বললেন, 'সে কি গো, পাঁচ ফোড়ন নেই, তা এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে না। তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্নুন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো, পায়সের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?'

দিদি তখন লজ্জা পেয়ে আনতে দিলে।

মা বললেন, ঠাকুরকে ছেলেরা সব বাঁড়ে (পরীক্ষা করে) নিয়ে তবে ছেড়েছে। বরানগর মঠে যখন ওরা ছিল, তখন আহা! নিরঞ্জন-টন ওরা সব কতদিন আধপেটা খেয়ে ধ্যান জপ নিয়ে কাটিয়েছে। একদিন সকলে বলাবলি করলে, 'আচ্ছা, আমরা যে ঠাকুরের নামে সব ছেড়ে ছুড়ে এলুম,

দেখি তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকলে তিনি খেতে দেন কিনা। সুরেশবাবু এলে কিছু বলা হবে না। ভিক্ষে টিক্ষেও কেউ করতে যাব না।'

এই বলে সব চাদর মুড়ি দিয়ে ধ্যান লাগিয়ে দিলে। সারা দিন গেল—রাতও অনেক হয়েছে, এমন সময় শোনে দরজায় কে ঘা মারছে। নরেন আগে উঠেছে, বলছে—'দেখ্ তো দরজা খুলে, কে? আগে দেখ্ তার হাতে কিছু আছে কিনা?'

আহা! খুলেই দেখে লালাবাবুর মন্দির থেকে ভাল ভাল সব খাবার নিয়ে একজন লোক এসেছে। দেখে তো সব মহা খুশি—ঠাকুরের দয়া টের পেলে। তখনি উঠে ঠাকুরকে ভোগরাগ দিয়ে সেই রাতে সকলে প্রসাদ পেলে।

এমনি আরও কতদিন হয়েছে। সিঁথির বেণী পালের বাড়ি থেকেও এমনি করে একদিন লুচি এসেছিল। এখন ছেলেরা তো মহাসুখে আছে। আহা! নরেন, বাবুরাম ওরা সব কত কষ্ট করে গেছে।

একবার···তিনদিন পাহাড়ে হেঁটে হেঁটে নরেনের খিদেয় মূর্ছা যাবার মত অবস্থা, এমন সময় এক মুসলমান ফকির একটি কাঁকুড় দেয়, সেইটি খেয়ে তবে বাঁচে। নরেন আমেরিকা হতে ফিরে এসে আলমোড়ার এক সভায় একদিন ঐ মুসলমানটিকে এক ধারে দেখতে পেয়ে উঠে গিয়ে তার হাত ধরে নিয়ে এসে সভার মাঝে বসালে। সকলে বললে, 'একি?'

তখন নরেন বললে, 'এ আমার জীবনদাতা,'—এই বলে ঘটনাটি সকলকে বললে। তাকে টাকাও দিয়েছিল। সে কিছুতেই নেবে না; বলে, আমি কি করেছি যে টাকা দিচ্ছেন? নরেন তা কি শোনে? অনেক বলে টাকা দিয়ে দিলে।

শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যম ভ্রাতা কালীচরণের ছেলে ভূদেবের বিয়েতে মা গিয়েছিলেন। বিয়ে উপলক্ষে একটা খেলাধুলার আয়োজন হয়েছিল। তাতে একজন বুকে পাথর ভেঙে খেলা দেখাচ্ছিল। সেই পাথর ভাঙবার সময় মা কেবল বলছিলেন, 'ঠাকুর, রক্ষা কর; ঠাকুর, রক্ষা কর।'

পাথর ভাঙা হয়ে গেলে পাশের একটি ভক্তকে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, ওরা কি মন্তর-টন্তর জানে?'

ভক্ত জবাব দিলেন, 'না মা, মন্তর-টন্তর কিছু নয়; এই রকম ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করেছে। আমি একটা গল্প শুনেছি—আমেরিকার কোন সাহেব একটি বাছুরকে প্রত্যহ কোলে করে দূরে গোচারণের মাঠে নিয়ে যেতো। ক্রমশঃ বাছুরটি বড় হয়ে ষাঁড় হল। তখনও সে কোলে করে নিতে পারতো, আর সকলকে এই খেলা দেখাতো। এ সবই অভ্যাসের কাজ।'

মা সে কথা শুনে বললেন, 'বটে, দেখলে অভ্যাসের কত শক্তি! এমনি জপ অভ্যাস করতে করতে মানুষ সিদ্ধ হয়—জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ।'

একবার কয়েকজন ভক্ত জয়রামবাটি গিয়েছিলেন। কোয়ালপাড়া মঠ হতে এমন সময় রওনা হলেন যে বেলা থাকতেই শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি পৌঁছবার কথা। সঙ্গে ঐ-দেশী একটি কুলীও ছিল। অনেকেরই জানা রাস্তা, কিন্তু মায়ের বাড়ির কাছে গিয়ে পথ ভুল হয়ে গেল। কিছুতেই আর পথ খুঁজে পেলেন না।

ঐ-দেশী লোকটিরও গোলমাল হয়ে গিয়েছে। ক্রমে রাত হল। ভক্তরা প্রমাদ গনলেন। তখন সকলেই ক্লান্ত। কি করেন—এক বাঁশ-বনের ভেতরে কম্বল পেতে সবাই বসে পড়লেন। মায়ের ওপর তাঁদের বড় অভিমান হল—'মা, আমরাই শুধু তোমাকে খুঁজবো, আর তুমি কিছুই দেখবে না!'

এমন সময় দেখা গেল একটি আলো নিয়ে রাসবিহারী ও হেমেন্দ্র এসে হাজির। রাত্রিবেলা এই পথে তাঁদের আগমনে সকলেই বিস্মিত হলেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা এদিকে আসবো কোন কথাই ছিল না। ভাগ্যে এপথে এসে পড়েছি।'

ভক্তরা গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোমরা বুঝি খুব ঘুরেছ?'

ভক্তেরা বললেন, 'হ্যাঁ মা, পথ ভুল হয়েছিল।'

একবার একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ের হাত ধরে একটি প্রৌঢ়-বয়স্ক ভদ্রলোক দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। মাকে বললেন, 'মা, এটি আমার মেয়ে। এর একটি মেয়ে হয়েছিল, আজ সকালে সেটি মারা গিয়েছে। এ শোকে বড় কাতর হয়ে পড়েছে, সান্ত্বনা পাবে বলে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।'

মা বললেন, 'এস মা, এস।'

মেয়েটি ঘরের মধ্যে এসে মায়ের কাছে বসল এবং পদধূলি নেবার জন্য হাত বাড়াল। মা একটু সরে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ গা, আমায় ছোঁবে কি? এর যে অশৌচ হয়েছে।'

একথা শুনে মেয়েটির মলিন মুখ আরও মলিন হয়ে গেল, সে দুঃখে ও লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়ল। মা তার দিকে তাকিয়ে কাতরকণ্ঠে বললেন, 'আহা, বাছা! বড় ব্যথা পেয়ে আমার কাছে এসেছে সান্ত্বনা পাবে বলে। আমি তোমার মনে কি কষ্ট দিলুম। তা হোক অশৌচ, এস মা আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর।'

এই বলে মেয়েটির আরও কাছে সরে বসলেন। মেয়েটি তখন অশ্রু ছলছল চোখে মায়ের চরণে মাথা রেখে প্রণাম করল। মাও তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

মেয়েটির কাছে বসেই মা মধুর বাক্যে তাকে প্রবোধ দিতে লাগলেন—'আমি তোমায় কি বলবো মা, আমি তো কিছুই জানি না। ঠাকুরের একখানি ছবি নিজের কাছে রেখো, আর জানবে তিনি সত্য—ঠাকুর তোমার কাছে রয়েছেন। তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে মনের দুঃখ জানাবে, ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলবে—ঠাকুর, আমায় তোমার দিকে নাও, আমায় শান্তি দাও। এ রকম করতে করতে তোমার প্রাণে শান্তি আপনি আসবে। ঠাকুরে ভক্তি রেখো, যখনই কষ্ট হবে ঠাকুরকে জানিও।'

তারপর ভক্তদের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, 'আহা! আজই শোক পেয়েছে। আজ কি স্থির হতে পারে?'

মেয়েটির বাবা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। পিতাপুত্রী দুজনেই মাকে প্রণাম করে শান্ত হয়ে চলে গেলেন।

কয়েকজন ভক্তসহ মা তীর্থ-পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। বৃন্দাবন থেকে তাঁরা গিয়েছিলেন হরিদ্বার। যোগেন মহারাজ সঙ্গে ছিলেন। পথে রেলগাড়িতে তাঁর ভীষণ জ্বর হল। এক ভক্ত তাঁকে বেদানা খাওয়াচ্ছিলেন। মা দেখলেন, ভক্ত যেন ঠাকুরকে বেদানা খাওয়াচ্ছে।

যোগেন মহারাজ জ্বরে বেহুঁশ হয়ে দেখলেন, ভীষণ এক মূর্তি তাঁর কাছে এসে বলছে—'তোকে দেখে নিতুম, কিন্তু কি করবো, পরমহংস-দেবের আদেশ—এখনই আমাকে চলে যেতে হবে, একদণ্ড আর থাকতে পারছি না।' লালপেড়ে কাপড়-পরা একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়ে বলল, 'ওকে কিছু রসগোল্লা খাওয়াস্।'

আশ্চর্যের বিষয়, ঐ দর্শনের পরই যোগেন মহারাজের জ্বর ছেড়ে গেল। পরে হরিদ্বার হতে সকলে গেলেন জয়পুর। সেখানে গোবিন্দজী দর্শন করে অন্যান্য বিগ্রহ দেখতে দেখতে হঠাৎ এক মন্দিরের পাশে এক মূর্তি দেখেই যোগেন মহারাজ বলে উঠলেন, 'এই মূর্তিকেই রসগোল্লা খাওয়াতে বলেছিল।'

সামনে একটি রসগোল্লার দোকানও পাওয়া গেল। তখন আট আনার রসগোল্লা এনে ঐ মূর্তিকে ভোগ দেওয়া হল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল—উহা মা শীতলার মূর্তি।

মা বলছেন—ঠাকুর যখন চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল আমিও চলে যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, না, তুমি থাকো। অনেক কাজ বাকী আছে। শেষে দেখলুম, তাই তো অনেক কাজ বাকী।

তিনি বলতেন, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখবে।

তিনশত বৎসর সূক্ষ্ম শরীরে ভক্ত হৃদয়ে বাস করবেন বলেছেন আর তাঁর অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আসবে।

যখন ঠাকুর চলে গেলেন, প্রথম প্রথম ভয় হত। পরনে সরু

লালপেড়ে কাপড়, হাতে বালা—লোকে কি বলবে। তখন কামারপুকুরে রয়েছি। তারপর ঠাকুরের দেখা পেতে লাগলুম। তখন সে-সব ভয় ক্রমে দূর হল। একদিন ঠাকুর এসে বললেন, 'খিচুড়ি খাওয়াও।' খিচুড়ি রেঁধে রঘুবীরকে ভোগ দিলুম। হিন্দুস্থানী কিনা, তাই খিচুড়ি। তারপর বসে ভাবে ঠাকুরকে খাওয়াতে লাগলুম।

বৃন্দাবন যখন যাই, পথে রেলে যেতে যেতে দেখি কি ঠাকুর গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলছেন, কবচটি যে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, দেখো যেন না হারায়।

তাঁর ইষ্টকবচটি আমার হাতে ছিল। আমি পূজা করতুম। তারপর ওটি মঠে দিলুম। এখন মঠে পূজা হয়।

ঐ কবচটি একবার ঠাকুরের তিথিপূজার দিন হারিয়েছিল। ফুল বেলপাতার সঙ্গে গঙ্গায় ফেলে দেয়। কারও খেয়াল ছিল না। ভাঁটায় গঙ্গার জল কমে গেলে রামবাবুর ছেলে ঋষি ওখানে খেলতে খেলতে গিয়ে ওটি পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসে।

মা ভক্তদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন, তাঁর ইষ্টকবচ, সাবধানে রাখতে হয়।

একদিন সকালে মা জয়রামবাটিতে কলমী শাক কুটছেন। একজন ভক্ত বললেন, 'মা, কলমী শাকের সঙ্গে এ কি কুটছ? এ যে ঘাস!'

মা বললেন, 'এ ঘাসফুলের শাক, কৃষ্ণের গায়ের এই ঘাসফুলের রং ছিল।'

দুপুর বেলা সকলে খেতে বসেছে। পাগলী মামী ঘরের বারান্দায় একটি ছেলেকে পাতা ও জলের গ্লাস দিয়েছে। বিড়ালে সে জলে মুখ দেওয়ায় আবার জল এনে দিল। আবার মুখ দেওয়ায় সে জলও বদলিয়ে দেওয়া হল। এর পরও দেখা গেল, একটা বেড়াল সেই জল খাচ্ছে। পাগলী বেড়ালটাকে তাড়া করে বলতে লাগল—'পোড়ারমুখো বেড়াল, মেরে ফেলব।'

তখন চৈত্র মাস। মা কাছেই ছিলেন, বললেন, 'না, না, পিপাসার সময় বাধা দিতে নেই। আর ও জলে তো মুখ দিয়ে ফেলেছে।'

পাগলী মামী চিৎকার করে বলল, 'তোমায় আর বেড়ালকে অত দয়া দেখাতে হবে না। মানুষকেই বড় দয়া করছেন। মানুষকে দয়া কর না।'

মা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার দয়া যার ওপর নেই সে নেহাত হতভাগ্য। আমার দয়া যে কার ওপর নেই তা বুঝি না—প্রাণীটা পর্যন্ত।'

একদিন এক ভক্ত মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, রাস্তাঘাটে কোন কোন লোককে দেখামাত্র মনে হয় যেন তাঁরা বিশেষ পরিচিত। পরে পরিচয়ে জানতে পারি তাঁরা ঠাকুরের বা আপনার ভক্ত। হঠাৎ দেখলে অত পরিচিত বলে বোধ হয় কেন?'

মা বললেন, 'ঠাকুর বলতেন, কলমীর দল, একটি ধরে টানলেই সবগুলি নাড়াচাড়া পড়ে। সব যে এক গাছের শাখা-প্রশাখা।'

সেই ভক্ত আর একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহ রক্ষা করেছেন। কিন্তু এবার আপনাকে রেখে ঠাকুর আগে চলে গেলেন কেন?'

মা বললেন, 'বাবা, জান তো ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।'

সমাপ্ত